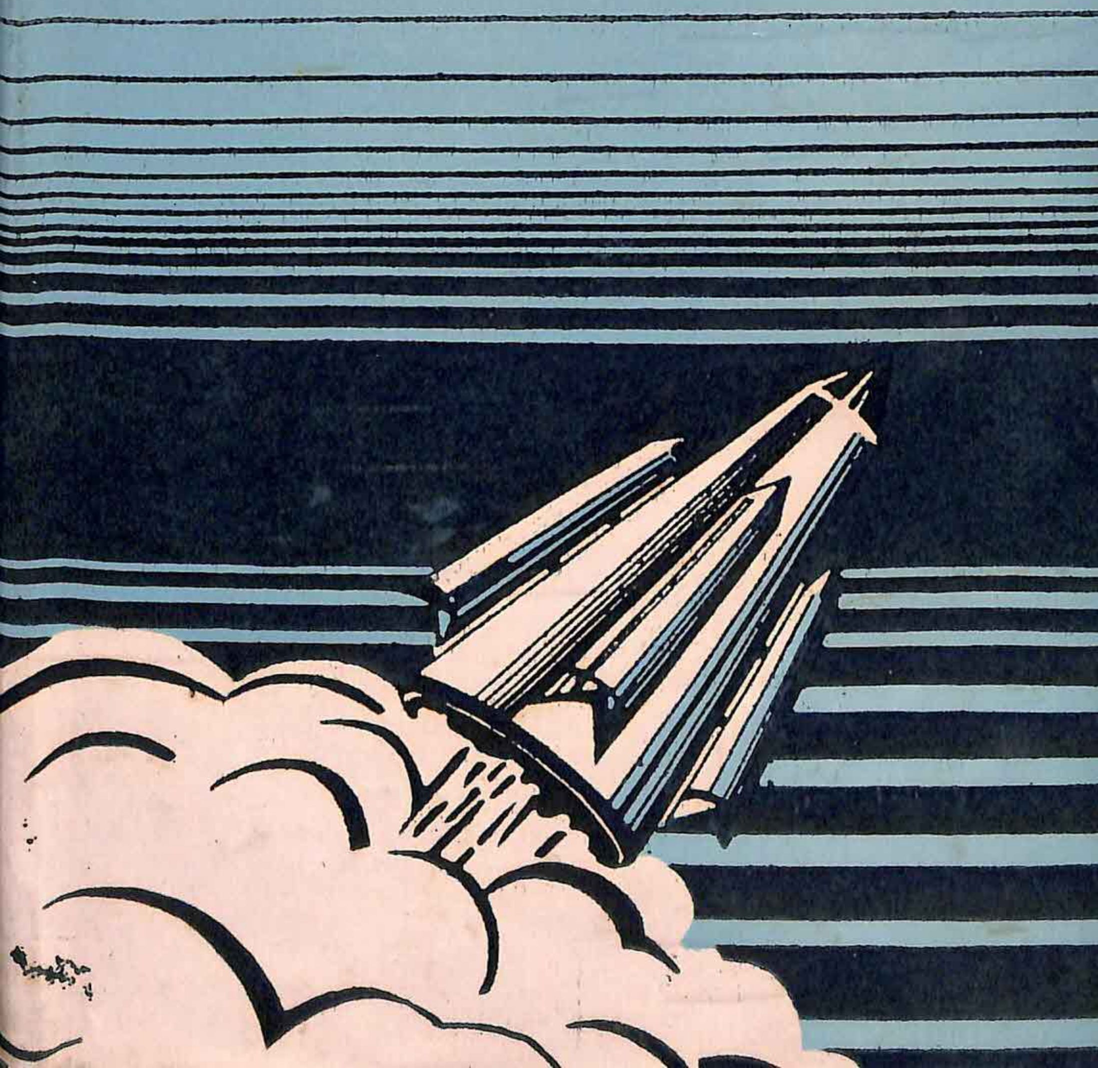
মহাকাশ বিজয় ও ভারতীয় বিজ্ঞানী



মহাকাশ বিজয় ও ভারতীয় বিজ্ঞানী

পরিমল চৌধুরী

এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
ভুবন ভট্টাচার্য
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মূল্য : আঠারো টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ— মার্চ, ১৯৮৯

মুদ্রক :
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পর্ব—প্রথম

নতুন যুগ—মহাকাশ-গবেষণার যুগ

বারই এপ্রিল, উনিশশ' একষট্টি সাল। মানুষের মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। সোভিয়েত দেশের নাগরিক মেজর য়ুরি গাগারিন ভোস্তোক-১ নামক মহাকাশযানের যাত্রী হয়ে পৃথিবীর ১৭৫ থেকে ৩০০ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে ৮৯.১ মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে একপাক ঘুরে পৃথিবীর মাটিতে আবার ফিরে এলেন।

তবে এই যে যুগ—যাকে আমরা বলি মহাকাশ-গবেষণার যুগ, তা শুরু হয়েছিল আরও কয়েক বছর আগে। সেদিনটি হল—৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ সাল। এইদিন সোভিয়েত বিজ্ঞানীগণ স্পুৎনিক-১ উপগ্রহকে আকাশে তুলেছিলেন। এই স্পুৎনিক-১ হল পৃথিবীর মানুষের কাছে, মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন যুগের প্রতীক।

এই ঘটনাটি বলা কত সহজ। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে মানুষের কত যুগের স্বপ্ন-দেখা আর নিরন্তর নিরলস সাধনা। মানুষের স্বপ্ন-দেখা সার্থক হয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনায়। সে এক ইতিহাস—বহু যুগের মস্ত এক ইতিহাস।

ইতিহাসে ফিরে গেলে

মানুষের বাস যখন গুহায় অরণ্যে—মানুষ তখন প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। আকাশের দিকে সে অবাক-চোখে তাকিয়ে দেখে চন্দ্র-সূর্য, রাতের আঁধারে আকাশে নক্ষত্রমালা। দেখে—দেখে, আর অবাক হয়। ভাবে, এসব কী কাণ্ডকারখানা। মনে জাগে তার ভয়, আশঙ্কা আর ভক্তি। প্রকৃতি রুদ্র হলে তার সমূহ বিপদ।

তাই ভয় আর আশঙ্কা। প্রকৃতি সদয় হলে তার বেঁচে থাকা সম্ভব। প্রকৃতি সদয়ের ফলে বৃষ্টি, তাতে জমিতে ফসল। নির্দয় হলে ঝড়, খরা আর বন্যা।

মানুষের তখন শৈশব। প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা তার ছিল সম্পূর্ণ অজানা। তাই সেযুগের মানুষ মনে করত প্রকৃতির এই অমোঘশক্তি তাদের প্রতি কখনো হয় নির্দয় আবার কখনো-বা সদয়। সুতরাং এই শক্তিকে পুজো কর, দেবতাজ্ঞানে পুজো করে তুষ্ট কর। এ থেকেই আদ্যিকালের প্রকৃতি-পুজো। ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা; সবকিছুই হল তখন দেবতা। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, ঝড়-বৃষ্টি-বাতাস—প্রত্যেকেই এক-একজন দেব-দেবী। এদের সবাইকে পুজো করে, যাগযজ্ঞ করে তুষ্ট করার ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হল প্রাচীন যুগে। মানুষের এই প্রাচীন বিশ্বাসকে বলে যাদুক্রিয়া বা ম্যাজিক।

আর এসব দেব-দেবীদের বাসস্থান কোথায়? মাথার ওপরে—আকাশে। যা হল দেবলোক বা স্বর্গ। মানুষের কল্পনায় এই স্বর্গ বা দেবলোক হল সুখের স্থান, শান্তির জায়গা। আর, এইসব দেব-দেবীদের নিয়ে নানা দেশের পুরাণে, ধর্মকথায় ও ধর্ম বিশ্বাসে ছড়িয়ে রয়েছে কত-না গল্প, কত-না কাহিনী।

বিশ্ব নিখিলের ধারণা

ভারত, চীন, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস—এইসব দেশে মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। আর, এইসব প্রাচীন সভ্যতাগুলির মানুষজন প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে দেবতাজ্ঞানে বিভিন্ন নাম দিয়ে, বিভিন্ন কাহিনী রচনা করে তাদের তুষ্ট করতে পুজো-আরাধনা করত।

এই যেমন, আমাদের দেশ ভারত। আমরা ভাবতাম, জানতাম—এক বিরাট সাপ, তার নাম হল বাসুকী। সে পৃথিবীকে তার

বিরাট ফণার ওপর ধারণ করে আছে। পৃথিবীকে ধারণ করতে করতে তার মাথা যদি একটু এদিক-সেদিক হয়ে যায়, তা হলেই প্রলয়—ভূমিকম্প।

প্রাচীন চীনে ড্রাগন হল এক অশুভ শক্তি। সেই হিংস্র ড্রাগন সূর্যকে গ্রাস করলে হত সূর্যগ্রহণ। ভারতে যেমন রাহুর গ্রাসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় বলে বিশ্বাস ছিল। চীনে গ্রহণ হলে সবাই মিলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিত সেই হিংস্র ড্রাগনকে তাড়াতে।

ব্যাবিলনীয়দের ভাবনাটা ছিল বেশ মজার। বিশ্ব হল আকারে গোল। তার চারদিকে রয়েছে কঠিন এক আবরণ। এই আবরণের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী। এই পৃথিবী আবার জলে ভাসছে। শুধু জলে ভাসছে নয়; তার ওপরেও জল, নিচেও জল। আর পৃথিবীর ঠিক ওপরেই রয়েছে জলপূর্ণ কঠিন এক গোলক। সেই জলপূর্ণ কঠিন গোলক থেকে কোন প্রকারে জল পড়লে হয় বৃষ্টি। পৃথিবীর নিচেও রয়েছে জলপূর্ণ গোলক। নিচের গোলক থেকে জল পৃথিবীতে উঠে আসে নদী হয়ে, ঝর্না হয়ে, ফোয়ারা হয়ে। গোলকটি হল দুই দরজা-বিশিষ্ট। একটি দরজা পূব দিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এরা সব পূবের দরজা দিয়ে ঢুকে পৃথিবীর ওপর দিয়ে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় আবার পূব দিকে আসার জন্যে।

আবার মিশরীয়দের একটা ভাবনা ছিল অন্য রকম। তারা ভাবত বিশ্ব হল চৌকোণা একটা বড় ঘরের মত। পৃথিবী হল এই ঘরের মেঝে। আর আকাশ হল তার ছাদ। আবার ঠিক-ঠিক ঘরের ছাদের মত নয়। পৃথিবীর চার কোণে চারটি পা রেখে যেন এক বিরাট গরু দাঁড়িয়ে আছে। আবার এমনও বিশ্বাস করা হত—আকাশ হল বিরাট এক ঢাকনা, অথবা এমন কোন এক রমণী যে তার দুই কনুই ও দুই হাঁটুর ওপর ভর রেখে উবু হয়ে বসে আছে। এই যে চার দেওয়ালওয়ালা পৃথিবী—এতে রয়েছে বহু

থাক। খেলার মাঠে যেমন দর্শকদের জন্যে থাক-থাক গ্যালারি থাকে, তেমনি। এই থাকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে এক নদী। তাদের কাছে চন্দ্রও দেবতা, সূর্যও দেবতা। দেবতারূপী চন্দ্র-সূর্য সেই নদীপথে এক নৌকায় যাতায়াত করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দরজা রয়েছে। সেইসব দরজা-পথেই তাঁরা যাতায়াত করেন। আর আকাশে যেসব নক্ষত্র স্থির থাকে, সেগুলি হল দেবতাদের বাতি। এইসব বাতি ঝুলছে গোলক থেকে। দেবতারা সব বাতি-ঝোলান গোলক হাতে ধরে আছেন। বাকি রইল সব গ্রহগুলি। এরাও এক একটি এক একজন দেবতা। আর, মিশরের নীল নদের মত আছে এক নদ। সে-নদ আকাশ-রাজ্যের নদ। সেখান থেকে বেরিয়েছে অনেক খাল। এইসব খালপথে পানসি ভাসিয়ে গ্রহ দেবতাদের যাতায়াত।

চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ বিষয়েও মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল অনেকটা ভারত আর চীন দেশের মত। আকাশ রাজ্যে বাস করে এক হিংস্র শূকরী। প্রতি মাসের মাঝামাঝি সেই শূকরী চন্দ্র দেবতাকে গ্রাস করতে শুরু করে দেয়। একসঙ্গে করে না, পনের দিন ধরে একটু একটু করে করে। আবার কখনো কখনো এমনও হয়, তার আর পনের দিন তর সয় না—একদিনেই গ্রাস করে ফেলে। তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ। তেমনি এক হিংস্র সাপের বাস হল আকাশ রাজ্যে। সেই সাপও মাঝে মাঝে সূর্য দেবতাকে গ্রাস করে। তখন এই অবস্থা হল—সূর্যগ্রহণ।

প্রাচীন যুগে জ্যোতিষী

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, আকাশ আর পৃথিবী নিয়ে প্রাচীন মানুষের এইসব বিশ্বাস থাকলেও তার পাশাপাশি ছিল, কিছু মানুষের কৃতিত্বপূর্ণ অসাধারণ কিছু কাজ। সে কাজ করে গেছেন এইসব প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতির্বেত্তাগণ।

এইসব দেশের প্রাচীন জ্যোতিষী আর পুরোহিতেরা মিলে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছরের হিসাব আর পঞ্জিকা-প্রণয়ন করে গেছেন। তখন তো কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। এইসব হিসাব না থাকলে তো চাষ-আবাদ প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ পঞ্জিকা না থাকলে অসুবিধা খুব।

ব্যাবিলনীয়রা আবিষ্কার করলেন সাতটি বার আর সপ্তাহ। আকাশের সাতটি গ্রহের নাম দিয়ে সেই নাম অনুসারে তারা বারগুলির নামকরণ করলেন। ব্যাবিলনীয়দের বহু পরেও আকাশে সাতটি গ্রহের অবস্থান বলেই ধরা হত। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ চন্দ্র, তারপর বুধ, তারপর শুক্র, তারপরে রবি, তারপরে মঙ্গল, তারপরে বৃহস্পতি এবং সবচেয়ে দূরের গ্রহ হল শনি। এই ছিল সে যুগের বিশ্বাস। তখন তো আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না—খালি চোখেই আকাশ দেখা চলত আর হিসাবপত্র করা হত।

ভারতে বৈদিকযুগে ত্রিশ দিনে মাস হিসাব করে বার মাসে বছর গণনা করা হত। কিন্তু ত্রিশ দিনের হিসাবে বার মাসে হয় ৩৬০ দিন। হিসাবে রয়ে গেল গোলমাল। পৃথিবী যে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে লাগে ৩৬৫.২৪২২ দিন। তাই সে-যুগে হিসাব ঠিক রাখার জন্যে দুই অমবস্যাযুক্ত ও রবিসংক্রান্তি-বর্জিত মাস কোনো কোনো বছরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হত। এই মাসের নাম হল মলমাস। একদিকে সৌরবৎসর, অন্যদিকে চান্দ্রবৎসর—এদের ঐক্যবিধান প্রয়োজন। মলমাস ছাড়া এই ঐক্য-বিধান সম্ভব নয়। ('মল' (সং) কথার অর্থ হল 'যুক্ত' + (মাস)। কিন্তু প্রাচীন চীনদেশে বছর গণনা করা হত ৩৬৫¼ দিনে। ইংরেজি পঞ্জিকায় চতুর্বৎসরান্তিক সনে ফেব্রুয়ারি মাসে ২৯ দিন হয়। ইংরেজিতে যাকে চলে 'লীপ-ইয়ার'—অধিবর্ষ।

এতো গেল প্রাচীন যুগের পঞ্জিকা। এর চেয়েও বড় সে-

যুগের আর একটি কৃতিত্ব হল—তারামণ্ডল থেকে সূর্যের অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করে রাশিচক্রের আবিষ্কার।

সেযুগের বিশ্বাস ছিল—সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, পৃথিবী স্থির। সূর্য ওঠে পূর্ব দিকে, অস্ত যায় পশ্চিমে। সূর্যের এটা হল আহ্নিক গতি। আবার তারা এও লক্ষ্য করলেন —সূর্য সারা বছর ধরে একই জায়গায় উঠছে না, গতিপথও এক নয়। তাহলে এই গতিপথটা চিহ্নিত করতে হয়। চিহ্নিত করতে হলে আকাশে যেসব তারা আছে তাদের অবস্থানের সঙ্গে তুলনামূলক এক বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। জ্যোতিষীগণ করলেনও তাই।

বছরে বার মাস। অর্থাৎ সূর্যের হল এটি বার্ষিক গতি। এক নির্দিষ্ট পথ দিয়ে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে বছরে একবার ঘুরে আসছে। এই যে ঘুরে-আসার পথ—এই পথটিই হল রাশিচক্র।

রাশিচক্র তৈরী করতে আকাশমণ্ডলকে ভাগ করা হল বারটি ভাগে। প্রতি মাসে সূর্য এক-একটি ভাগ পার হয়ে আসে। আর এই বারটি বিভিন্ন ভাগে রয়েছে বিভিন্ন তারামণ্ডল। ব্যাবিলনীয়গণ এইসব তারা ও তারামন্ডলের নামকরণ আগেই করে দিয়েছেন। সে যুগে নানা পশুকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হত। তাই তারা এক-একটি তারামণ্ডলের নামকরণ করেছিলেন এক-একটি পশুর নামে।

রাশিচক্র মোট বারটি ভাগে বিভক্ত। ভারতে বৈদিকযুগের ঋষি বা জ্যোতিষীগণও এদের নামকরণ করেছেন একই প্রক্রিয়ায়।

ভারতীয় মতে এই বারটি রাশি হল ঃ মেষ—বৈশাখ মাস, বৃষ—জ্যৈষ্ঠ মাস, মিথুন—আষাঢ় মাস, কর্কট—শ্রাবণ মাস, সিংহ —ভাদ্র মাস, কন্যা—আশ্বিন মাস, তুলা—কার্তিক মাস, বৃশ্চিক—অগ্রহায়ণ মাস, ধনু—পৌষ মাস, মকর—মাঘ মাস, কুম্ভ—ফাল্গুন মাস, মীন—চৈত্র মাস।

এতো গেল বারটি ভাগের বিষয়। আমাদের দেশের ঋষিগণ আবার দেখালেন এই রাশিচক্রে রয়েছে সাতাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সূর্যের গতিপথ নির্দেশ করতে এই নক্ষত্রগুলির আনুপাতিক হিসাব তাঁরা দেখালেন, অবস্থান দেখালেন, নির্দিষ্ট করে নাম দিলেন। আর করলেন—পূর্বে বার ভাগে বিভক্ত রাশিচক্রকে সাতাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আকাশমণ্ডলে অবস্থান ও নামানুসারে সাতাশ ভাগে বিভক্ত করলেন। কোন কোন দেশে আবার আটাশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল।

আর্য ঋষিগণ যে সাতাশটি নক্ষত্রের নামকরণ করেছেন বৈশাখ মাস থেকে শুরু করলে তা হল ঃ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধর্মিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপথ, উত্তর ভাদ্রপথ এবং রেবতী ইত্যাদি। এই সাতাশটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ করতে ধ্রুবতারার অবস্হান তাদের খুব সহায়ক হয়েছিল।

পর্ব—দ্বিতীয়

নতুন ভাবনা

এরপর কেটে গেছে যুগের পর যুগ। এবার দেখা দিল নতুন চিন্তা-ভাবনার যুগ, নতুন জিজ্ঞাসার যুগ। মানুষের স্বভাব হল জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা, আর তার উত্তর খোঁজা। এই নতুনতর জিজ্ঞাসা দেখা দিল গ্রীস দেশে। সেখান থেকে কালে কালে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ইউরোপ মহাদেশে।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় প্যাপিরাসের পুঁথিতে, মেসোপটেমিয়ার লোক গাথায়, ঐতিহাসিক হেরোদোতাসের লেখায় মহাকাশ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার অনেক খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম যিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও ঈশ্বরের বিষয়ে দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন তিনি হলেন মাইলেটাসের থালীস। ৬১৪ (অনুমান) থেকে ৫৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মানুষ তিনি। সে যুগে বসে তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব-জগতের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। এর মধ্যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আমাদের এসব বুঝতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এইসব কথা বলা সত্যিই দুঃসাহসিকের কাজ।

থালীস সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। একবার আকাশ দেখতে দেখতে পথ চলছিলেন তিনি। পড়ে যান এক কুয়োয়। এক মহিলা উদ্ধার করেন তাঁকে। গাধা আর তার নুনের বোঝা, দাদন দিয়ে ঘানিকল আটকান—এসব গল্প থালীসকে নিয়েই। তাই লোকে তাকে পাগল বলত। পাগলকে তো আর কেউ শাস্তি দেয় না। তাই প্রকৃতি হল নিয়মের রাজ্য, এখানে ঈশ্বর বলে কেউ নেই—একথা বলেও সে যুগে তিনি রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন।

থালীসের মত হল—সৃষ্টির মূল উপাদান জল। আকাশে মাটিতে গাছপালায় জীবদেহে—সর্বত্রই দৃশ্য ভাবে অথবা অদৃশ্য ভাবে জল রয়েছে। আর এই পৃথিবী—যার আকার তাওয়ার মত, ভাসছে জলের ওপর। সবকিছুই একদিন এই জলেই লয় হবে।

দার্শনিক থালীস হলেন গবেষণামূলক বিজ্ঞানের আদিগুরু। অলৌকিকতাকে বাদ দিয়ে, ঈশ্বরকে একপাশে সরিয়ে রেখে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বিশ্ব সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করেছেন তা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এরপরে নাম উল্লেখ করতে হয় গ্রীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জোতির্বিদ পিথাগোরাসের। মাইলেটাসের কাছে সামোস নামক এক দ্বীপে খ্রীস্টপূর্ব ৫৭২ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৪৯৭ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ। দার্শনিক থালীস তাঁকে অনুপ্রাণিত করে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। পরে মিশর থেকে সামোসে ফিরে এসে টিকতে না পেরে চলে যান ক্রোটোনাতে। সেখানে তিনি আপন মতালম্বীদের নিয়ে গুপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিদ্যানুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই কেন্দ্রে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করা হত। তিনি গণিতের সূত্রের সাহায্যে মানুষের মন ও আত্মা থেকে শুরু করে সবকিছুকেই এক সামগ্রিকতার মধ্যে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে সবকিছুই নিয়েই যেন একটা গোলক। এই গোলকের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে সংগীত সবচেয়ে সহজ মাধ্যম। কারণ সংগীত এলোমেলো নয়। সুর নির্ভর করছে সংখ্যার ওপরে এবং তা নির্দিষ্ট অনুপাতে বাধা রয়েছে।

এবার তিনি এই সংখ্যা এবং সংগীত দিয়েই বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বাদ্যযন্ত্রে এক একটি দৈর্ঘ্যে এক একটি সুর বাঁধা থাকে। যিনি সংগীতজ্ঞ, তিনি বোঝেন ভাল। এই সংগীতের

মতোই এক-একটি দৈর্ঘ্যে বাধা রয়েছে প্রতিটি গ্রহ। পৃথিবী থেকে চন্দ্র, চন্দ্র থেকে বুধ, বুধ থেকে শুক্র, শুক্র থেকে রবি, রবি থেকে মঙ্গল, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি থেকে শনি, শনি থেকে আকাশে স্থির নক্ষত্রমণ্ডল—সবই বাদ্যযন্ত্রের সুরের মত পারস্পরিক এক বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যে বাঁধা। সংগীতজ্ঞ যেমন বাদ্যযন্ত্রের সুরের দৈর্ঘ্য-বিষয়ক নিয়মটা বুঝেন এবং জানেন, ঠিক তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির যিনি বিধাতাপুরুষ—তিনি জানেন এই সুরের নিয়ম-কানুন।

পিথাগোরাস বলে গেছেন—বিশ্ব হল গোলকের মত। চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলি এক-একটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে। আর এক-একটি বৃত্ত হল বাদ্যযন্ত্রের এক-একটি তার। বাদ্যযন্ত্রের তার থাকে টানা। কিন্তু বিশ্বরূপ বাদ্যযন্ত্রের তার টানা থাকে না। থাকে গোলাকার হয়ে। আর, এই প্রত্যেকটি গোলক থেকে যে পৃথক পৃথক সুর উঠছে, সেইসব মিলে যে ঐকতান, তা হল নিত্য-বিশ্বসংগীত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ধারণা ছিল পৃথিবী গোল। ধারণাটা নানাকারণে সে যুগে মানুষের মনে ধরেছিল। গ্রীস দেশের মানুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে বহু উত্তর দিকে গেছেন। তারা নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে গল্প করেছেন। গল্প যদি সত্যি হয়, তবে মেরু অঞ্চলের অভিজ্ঞতা তো ভয়ানক। এমনি আর একটি ভয়ানক কাণ্ড করে ফেললেন পিথাগোরাসের শিষ্য ফিলোলাউস। তিনি বললেন—পৃথিবী শুধু গোলাকারই নয়, তার গতি আছে। তার মানে—পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খেয়ে ঘুরছে নয়, ঘুরছে একটি গোলকে। রাশিচক্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রহ ও সূর্যের যে বার্ষিক গতি তা ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা ছিল। এই থেকেই ফিলোলাউসের ধারণা হয়েছিল পৃথিবী একটি গোলকে ঘুরছে।

ফিলোলাউস নয়টির ক্ষেত্রে দশটি গ্রহ কল্পনা করেন। এই দশম গ্রহটিকে তিনি বলেন বিপরীত পৃথিবী। বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে এই বিপরীত পৃথিবী। বিপরীত পৃথিবী হল একটি কেন্দ্রীয় অগ্নি, যা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। এই কেন্দ্রীয় অগ্নিকে ঘিরে গ্রহগুলি এককেন্দ্রীয় গোলকে ঘুরছে। কেন্দ্রীয় অগ্নি রয়েছে পৃথিবীর বিপরীত দিকে, তাই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। তাঁর মতে—কেন্দ্রীয় অগ্নির পরে রয়েছে পৃথিবী, তারপরে চন্দ্র, তারপরে সূর্য, তারপরে অন্যান্য গ্রহগুলি এবং সবশেষে আকাশের স্থির নক্ষত্রগুলি। সব গ্রহগুলিই এক-একটি পৃথক গোলকে ঘুরে চলেছে।

পিথাগোরাসের শিষ্যদের মতে, এই 'গোলক' হল সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘনবস্তু। পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের শিষ্যগণ দ্বাদশ তলকে মহামণ্ডল বা মহাবিশ্ব (Universe) বলেছেন।

পিথাগোরাসের এই শিষ্যগণ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোকের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বিরোধী মত প্রকাশ করায় অনেকেই সেদেশের লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিলেন। এক-জনের প্রাণহানিও ঘটে, অনেককে দেশ থেকে পালিয়ে যেতেও হয়।

ফিলোলাউসের তত্ত্ব অনেকটা উদ্ভট কল্পনা হলেও পৃথিবী যে গতিশীল, একথা তিনি বলেছিলেন প্রথম। ফিলোলাউসের বিশ্বতত্ত্বের ভাবনায় প্রথম ধরা পরে পৃথিবীর দুটি গতি—আহ্নিক-গতি ও বার্ষিক-গতি।

ফিলোলাউসের আহ্নিক-গতির ভাবনা-চিন্তায় একটা পরিণত রূপ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালের এক গ্রীক জ্যোতির্বিদ হেরাক্লিডিস। হেরাক্লিডিস খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩১৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্লেটোর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ অ্যারিস্টটলও তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

হেরাক্লিডিসের সময় বিপরীত-পৃথিবীর তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়। তবে বিশ্বতত্ত্বে আহ্নিক-গতির ধারণাটি আরও উন্নতি লাভ করে। হেরাক্লিডিস বললেন, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর পাক খেয়ে ঘুরে চলেছে। এটি হল পৃথিবীর আহ্নিক-গতি। এই আহ্নিক-গতির জন্যেই মনে হয় গোটা আকাশটা ঘুরছে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এবার। পৃথিবী ঘুরছে, তাই তো মনে হয় আকাশও ঘুরছে। তবে বার্ষিক-গতির বিষয় কী হবে? আকাশের নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক অবস্থান তো সারা বছরে একই, তারা তো স্থির। স্থির নক্ষত্রগুলি না হয় আকাশের গোলকে একই স্থানে অবস্থান করছে, আর গোলকটি ঘুরছে অথবা পৃথিবী ঘুরছে। তবুও গোলমাল থেকে যাচ্ছে, সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সে সমস্যা আকাশের গ্রহগুলিকে নিয়ে। তারা যেভাবে আকাশে ঘুরছে তার সঙ্গে রাশিচক্রের মোটামুটি মিল দেখা যাচ্ছে। গ্রহগুলির এই গতিবিধিরও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করলেন হেরাক্লিডিস।

হেরাক্লিডিস তাঁর বিশ্বতত্ত্বে বললেন, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। বুধ এবং শুক্র ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। আর, এই দুটি ঘূর্ণমান গ্রহকে নিয়ে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আর —মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—এই তিনটি গ্রহ পৃথক পৃথক গোলকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে।

পিথাগোরাসের মতালম্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীস্টপূর্ব ৩১০—২৩০)। 'সূর্য ও চন্দ্রের আকার ও দূরত্ব বিষয়ে' নামক তাঁর একটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য তিনি নিজস্ব মৌলিক পদ্ধতিতে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও সূর্যঘড়ি তৈরি করেছিলেন। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকে বলা হয়ে থাকে—পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী। সে যুগে তো দূরবীন আবিষ্কার হয়নি।

তাই পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করে চন্দ্র ও সূর্যের আকার এবং পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব কতটা—এই হিসাবে গোলমাল রয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি ছিল সঠিক।

তিনি বলেছিলেন—সূর্যকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব। আয়তনে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড়। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সূর্যের অবস্থান। অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আর্কিমিডিস তাঁর এক গ্রন্থে অ্যারিস্টার্কাসের বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখ করে গেছেন।

পুরানো বিশ্বাস—ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব

পিথাগোরাসের শিষ্য ও মতাবলম্বীদের পরে গ্রীক দার্শন ও বিজ্ঞানের জগতে শুরু হয় এক অন্য যুগ—পিছন দিকে ফিরে চলার যুগ। এ-যুগ চলেছিল প্রায় সতেরো-শ' বছর ধরে। আর এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনার মূল কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক। অ্যারিস্টার্কসের পরে এই অবস্থা শুরু হয়েছিল দার্শনিক প্লাতো-র (খ্রীস্টপূর্ব ৪২৭—৩৪৭) ভাবনা-চিন্তার ধারক ও বাহক অ্যারিস্টটলের (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪—৩২২) সময় থেকে। প্লাতো, অ্যারিস্টটল, টলেমি (খ্রীঃ ২য় শতক)—এঁরা সবাই ছিলেন সেই পুরানো ভাবনায় বিশ্বাসী।

প্লাতোর মতে—বিশ্বের আকার হল একটি নিখুঁত নিটোল গোলক। এদের গতিপথও বৃত্তাকার। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য সমস্ত জ্যোতিষ্কই নিখুঁত বৃত্তাকার। সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি ত্রুটিহীন। তাই তার বিশ্বসৃষ্টিও নিখুঁত বৃত্তাকার।

অ্যারিস্টটলের বিশ্বব্যাখ্যা হল—বিশ্বের কেন্দ্রে অনড় অবস্থায় রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবীকে ঘিরে নয়টি এককেন্দ্রীয় গোলক রয়েছে। এরা সবাই অতি নির্মল ও আলো দ্বারা ভেদ্য।

গোলকের প্রথমে চন্দ্র, তারপরে যথাক্রমে সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। এছাড়া বাইরের দিকে রয়েছে আরও দুটি গোলক। এই দুই গোলকে অবস্থান হল স্থির নক্ষত্রগুলির। এরও বাইরে যে গোলক, সেই গোলকে বসে বিশ্বসৃষ্টিকর্তা পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর গোলকগুলিকে পরিচালনা করে চলেছেন।

বহুমুখী প্রতিভাধর টলেমি সূর্য-চন্দ্র-গ্রহের গতি, চন্দ্রগ্রহণ, বছরের পরিমাপ ও পঞ্জিকা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মত হল—বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবী থেকে আমরা চন্দ্রের একটা গতি লক্ষ্য করে থাকি। এই গতি হল চন্দ্রের দুটি গতির যোগফল। চন্দ্রের একটি গতি হল কেন্দ্রাপসারী বৃত্তে। কেন্দ্রাপসারী বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র এক পরিবৃত্তেও ঘুরে চলেছে। বিষয়টা খুবই জটিল। যেন একটি বড় ঘুরন্ত চাকার পরিধির ওপরে ঘুরে চলেছে আর একটি ছোট চাকা—কোন গোলক নয়। টলেমি সমস্ত গ্রহগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন এই কেন্দ্রাপসারী বা পরিবৃত্তের সাহায্যে। পৃথিবী থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রহই এক ঘুরন্ত চক্রের সঙ্গে যেন বাঁধা রয়েছে। চক্রের মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকে অর্পণ করেছেন।

বিশ্ব-ভাবনার ক্ষেত্রে এই গোলক আর চক্রের প্রভাব চলেছিল প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। ফলে জ্যোতির্বিদ্যায় সেকালে আর কোন উন্নতিই হয়নি।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও নতুন-দিগন্ত

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলে আসা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক অন্ধ বিশ্বাসকে ভাঙার কাজের সূত্রপাত ঘটালেন পোল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস (খ্রীঃ ১৪৭৩—১৫৪৩)। পোল্যাণ্ডের থর্ণে তাঁর জন্ম হলেও ইতালির ক্রাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার সময় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যোতিষ ও

গণিত চর্চা শুরু করেন। যদিও তিনি ছিলেন ফ্রাউয়েনবুর্ক গির্জার অনুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ক পদে অধিষ্ঠিত। অবসর সময়েই তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত নিয়ে চর্চা করতেন।

কোপারনিকাসের লক্ষ্য ছিল—তাঁর সময় পর্যন্ত সৌরমণ্ডল বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলির উপর নির্ভর করে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু একটা করা। এবিষয়ে তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম হল 'স্বর্গীয় গোলক আবর্তন বিষয়ে' (On the Revolution of the Heavenly Spheres)। ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছায়। যদিও ১৫৩০ সালের মধ্যেই তিনি এই গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। জীবিতকালে তিনি হয়ত সৌরজগৎ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব—এই তত্ত্ব প্রকাশ করলে বা প্রচার করলে নিশ্চয়ই একদল গোঁড়া ধর্মযাজক এবং রাষ্ট্রনেতাদের বিরাগভাজন হয়ে অত্যাচারিত হতেন। জীবনের শেষদিকে এক তরুণ গবেষকের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে শেষে গ্রন্থটি ছ'টি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তত্ত্বের বিবরণ, জ্যোতিষ বিষয়ে গাণিতিক সূত্র, পৃথিবীর গতি, চন্দ্রের গতি এবং গ্রহের গতির বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

কোপারনিকাস তাঁর বিশ্ব-বিষয়ক বৈপ্লবিক তত্ত্বে বলেছেন ঃ—

স্থির নক্ষত্রদের গোলকের সীমানার মধ্যেই সীমিত, পরিসরে বিশ্বের অবস্থান।

সূর্যের অবস্থান হল বিশ্বের কেন্দ্র। সূর্য এবং নক্ষত্রদের গোলক স্থির।

স্থির ও অনড় সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরছে। সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে গ্রহগুলি হল—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি।

চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে। এই হল পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এইজন্যই মনে হয় গোটা আকাশটাই ঘুরে চলেছে। আর, পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে মনে হয় সূর্য যেন রাশিচক্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

পৃথিবীর এই বার্ষিক আবর্তনের ফলে আকাশের গ্রহগুলিকে দেখে মনে হয়, কখনো বা তারা গতিহীন, আবার কখনো বা তারা পিছনের দিকে চলেছে।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, কোপারনিকাসের বিশ্ব-বিষয়ক এই বৈপ্লবিক তত্ত্ব সেই অনড় বিশ্বাসের মূলে হানল কুঠারাঘাত, আর—খুলে দিল এক নতুন-দিগন্ত।

কোপারনিকাসের পর থেকে শুরু হল এক দুঃসাহসী অনুসন্ধিৎসার যুগ। এ যুগের সূত্রপাত ঘটালেন ডেনমার্কের বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (খ্রীঃ ১৫৪৬—১৬০৬)। কোপেনহেগেন লাইপৎসিক এবং রোস্টক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন। গণিতে ও জ্যামিতিতে তাঁর খুব গভীর জ্ঞান না থাকায় তিনি তাত্ত্বিক না হলেও আধুনিক কালের যে পর্যবেক্ষণ-মূলক জ্যোতির্বিদ্যা তার জনক তিনি। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি বিপুল পরিমাণে নির্ভুল ও নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি কেপলারের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। টাইকো ব্রাহের নির্ভুল তথ্য এবং পর্যবেক্ষণকে সামনে রেখেই কেপলার তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন।

জার্মানির বিজ্ঞানী যোহান কেপলারের (খ্রীঃ ১৫৭১—১৬৩০) জন্ম স্টুটগাটের কাছে ভীল ডেয়ার স্টাট্-এ এক দরিদ্র পরিবারে।

শিশুকালে এক অসুখে তাঁর বাঁ হাতটি পঙ্গু হয়ে যায়। দৃষ্টি-শক্তিও খুব কমে যায়। তাই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল টাইকো-ব্রাহের পর্যবেক্ষণের ওপর। তিনি নিজের একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ টাইকোব্রাহেকে পাঠানোর পর তাঁদের দুজনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন গ্রেৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পরে টাইকোব্রাহের সংগৃহীত তথ্যগুলি তাঁর হাতে এলে তারই ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন।

পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে কেপ্‌লার জ্যোতিষ্কের গতি নিয়ে দীর্ঘ আট বছর ধরে অঙ্ক কষে চললেন। কিন্তু, কিছুতেই অঙ্কের ফলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল মিলছে না। সবাই বলেছেন, আকাশের জ্যোতিষ্কের গতি বৃত্তাকার। এবার তাঁর মাথায় এল, বৃত্তাকার না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। উপবৃত্তও হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার নতুন করে অঙ্ক কষতে বসলেন। এবার—আশ্চর্য! অঙ্কের ফলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল একদম মিলে গেল। বহুকালের যে ধারণা —বৃত্ত, সেই বৃত্তের ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। বৃত্তের সুদৃঢ় বন্ধন থেকে জ্যোতির্বিদ্যাকে তিনি মুক্তি দিলেন তিনটি মূল সূত্রের মাধ্যমে।

যোহান কেপ্‌লারের মূল বক্তব্য হলঃ (ক) সমস্ত গ্রহগুলিই সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। (খ) সূর্যের অবস্থান হল উপবৃত্তের ফোকাসে। (গ) সূর্য থেকে প্রতিটি গ্রহের দূরত্ব নির্দিষ্ট। গ্রহগুলির বেগও নির্দিষ্ট। বিশেষ গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে গ্রহগুলির অবস্থান ও বেগ নির্ধারণ করা যায়।

টাইকোব্রাহের পর্যবেক্ষণ এবং কেপ্‌লারের বিজ্ঞান-ভিত্তিক দুঃসাহসীক অনুসন্ধিৎসার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে ভিত্তি রচিত হল সেখানে পরবর্তীকালে সৌধসৃষ্টি করতে এলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি।

মধ্যযুগে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সত্যই দুঃসাহসী। সে যুগের ইতিহাসে একথাই বলে। ইতালিক দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনো সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় ধর্মবিরোধী বলে তাঁকে আখ্যা দিয়ে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিও শেষ জ্ঞানে চরম অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

ইতালির পিসা নগরে এক সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবারে গ্যালিলিও গ্যালিলির (খ্রীঃ ১৫৬৪—১৬৪২) জন্ম। আধুনিক পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের জনক তিনি। অতি বাল্যকাল থেকেই একাধারে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ মননশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মডেল তৈরির অসাধারণ দক্ষতা তিনি অর্জন করেন। বাল্যকালে নিয়মিত লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও বার বছর বয়সে জেসুইট মঠের স্কুলে ভর্তি হয়ে অতি অলপদিনের মধ্যেই গ্রীক ও লাতিন ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর পিতা ভয় পেয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। পুত্রের অসাধারণ মেধা ও বিজ্ঞান সাধনায় প্রতিভা দেখে পিতা প্রেরণা দেন বিজ্ঞান সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করতে। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য সতের বছর বয়সে তাঁকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

বিপ্লবী গ্যালিলিওর চিন্তার জগতে বিপ্লব দেখা দিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে। গতানুগতিক মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিল তাঁর চিন্তায়। সবকিছুই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভরই শুধু নয়, তা হল তীব্র মননশীল ও যুক্তি-নির্ভর। অখণ্ড তাঁর যুক্তিজাল। প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হলেও প্রত্যাঘাতের সুযোগ খুঁজতে শুরু করল। অ্যারিস্টটলের চিন্তা ও মতামতের মধ্যে ভুলত্রুটি আবিষ্কার করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও হলেন বিরক্ত।

ইউক্লিড, আর্কিমিদিস প্রভৃতি মনীষীদের কাজগুলি অধ্যয়ন করার পর গণিতের ওপর এক প্রবল আকর্ষণ তাঁর জন্মায়। বিশেষতঃ আর্কিমিদিসের কাজ—পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ে গণিতের সফল প্রয়োগ তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি শুরু করলেন পরীক্ষা। পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বসমূহকে গাণিতিক সূত্রে ব্যাখ্যা করলেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে গণিতের যে নিবিড় যোগসূত্র —এই সফল আবিষ্কারের জন্য তিনি হলেন আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক।

চার বছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর পিতার অসচ্ছলতার জন্য ডিগ্রি না নিয়েই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হল। এবার শুরু হল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং একের পর এক আবিষ্কার।

মিশ্রিত ধাতুসমূহের মধ্যে কোন একটি ধাতুর পরিমাণ নির্ণয় হেতু আর্কিমিদিসের অনুসরণে এক নতুন নিক্তি তিনি তৈরি করলেন।

গির্জায় দোলায়মান বাতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সূত্র আবিষ্কার করলেন মাত্র আঠার বছর বয়সে।

এসময়ে গণিতেও তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর নির্ভীক ও স্বাধীন মতামতের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও পিসা, ফ্লোরেন্স, বোলাগনা, রোম ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাহসের অভাবে তাঁকে গণিতের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করতে প্রত্যাখ্যান করে। শেষে যখন তিনি পূর্ব ইউরোপ চলে যাওয়ার সংকল্প করেন তখন তাঁর বন্ধুদের প্রচুর চেষ্টায় পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদটি অধিকার করতে সক্ষম হন। এই পদটি লাভ করেই তিনি বিজ্ঞানসাধনায় সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কারগুলি হল—সাইক্লয়েড আবিষ্কার, অ্যারিষ্টটলের মতবাদের

অনেকগুলিই ভুল প্রমাণ করা, বস্তুর ত্বরণ ও জাড্য আবিষ্কার, বিভিন্ন ওজনের বস্তুর নেমে আসার গতিবেগ প্রভৃতি। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে এইসব আবিষ্কার করায় তিনি প্রাচীন-পন্থীদের বিরাগভাজন হন এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়। এর কিছুকাল পরে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শুরু হল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-সাধনা এবং একের পর এক আবিষ্কার। এখানে তিনি 'ভার্চুয়াল ওয়ার্ক' নামক এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সারা ইউরোপে তাঁর আবিষ্কৃত একটি সেক্টরের চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদার জন্যে সে সময় তাঁকে একটি কারখানা খুলতে হয়। এই কারখানাতেই তিনি দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এছাড়া তরল পদার্থের ধর্ম, পাম্পের কার্যপ্রণালী, সমরস্থাপত্য এবং দুর্গ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও গবেষণালব্ধ বিষয়াবলীর ওপর বক্তৃতা শুনতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে পাদুয়াতে ভিড় জমাতে শুরু করে।

১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি দূরবীন আবিষ্কার করে তার সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রাচীনপন্থীদের বিশ্বাস ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি কোপারনিকাসের তত্ত্ব সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রমাণ করলেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে একটি সুপার নোভার আবির্ভাব ঘটে। হাজার হাজার আগ্রহী মানুষের সামনে তিনি এই নতুন নক্ষত্রটির তাৎপর্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন —অপরিবর্তনীয় বিশ্বের কল্পনা ভুল, নতুন নক্ষত্রটির আবির্ভাব থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দূরবীনের সাহায্যে অনন্ত

বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে তার রহস্য তিনি দেখতে লাগলেন। আর একের পর এক নতুন নতুন আবিষ্কার করে চললেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কার হল—নক্ষত্র ও গ্রহগুলির মধ্যে তফাতটা কোথায়। কারণ নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে যে তফাত তা তাঁর আবিষ্কারের আগে খালি চেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যেত না। এবার দূরবীনের তা সম্ভব হল।

তিনি আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীর মত চাঁদের উঁচু পাহাড় আছে, গহ্বর আছে। চাঁদ হল একটি শুষ্ক প্রস্তরময় গোলক।

ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বললেন, আপাতদৃষ্টিতে এটি চাদরের মত হাল্কা আলোর পোঁচ হলেও তা ঠিক নয়। অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড় সেখানে।

তিনি আবিষ্কার করলেন, বিশালকায় বৃহস্পতি ও তার চারটি প্রদক্ষিণরত উপগ্রহকে। চাঁদ যেমন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এগুলিও তেমনি বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরছে।

এবার আবিষ্কার করলেন শুক্রগ্রহের কলা এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধি —চাঁদের যেমন শুক্রের তেমনি।

তাঁর এইসব আবিষ্কারের ফলে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। কোপারনিকাসের তত্ত্বই সঠিক—শুক্র পৃথিবীর কাছে, সূর্য দূরে। শুক্রের নিজস্ব আলো নেই—সূর্যের আলোতেই সে আলোকিত এবং সেই আলোই প্রতিফলিত করছে।

অকলঙ্ক সূর্যের ধারণা ছিল পূর্ববর্তীদের ধারণা। তিনি দেখালেন, সূর্যেরও কলঙ্ক আছে এবং সূর্যের সেই কলঙ্ক পূব থেকে পশ্চিমে সরে সরে যায়। সূর্যও আবর্তনশীল তিনি তা প্রমাণ করলেন। এইসব আবিষ্কারের কথা 'দি মেসেঞ্জার অব দি স্টার্স' (The Mesenger of the Stars) গ্রন্থের প্রকাশ করলেন।

এইসব আবিষ্কারের প্রত্যেকটিই হল সে যুগের ভয়ংকর আবিষ্কার। বিশ্বব্যাপী এইসব ঘটনা যেমনি তাঁকে যশের মুকুট পরাল, তেমনি অন্যদিকে তাঁকে পরান হল কাঁটার মুকুট। বাইবেল প্রচারিত বিশ্বতত্ত্বের ওপর মানুষ আস্থা হারাতে পারে। যাজকীয় সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে উঠতে পারে। তাই, গির্জার কার্ডিনাল ডেকে পাঠালেন গ্যালিলিওকে। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন—সূর্য বিশ্বজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং স্থিতিশীল—এই উদ্ভট বক্তব্য তোমায় শুধু প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ভবিষ্যতে গ্রহ-সূর্য ইত্যাদি বিষয়ে কোন কথাও বলা চলবে না। —এই হল পাদ্রীদের পতাকাতলে সমবেত প্রাচীনপন্থী প্রভাবশালী লোকেদের প্রতিভূ কার্ডিনালের রায়। এই রায় শোনার পরে গ্যালিলিও মৃদুস্বরে বলেছিলেন—"তবুও পৃথিবী ঘুরছে"—(Bu: the earth does move)। এ গ্লানি—মনীষী গ্যালিলিওর পরাজয়ের গ্লানি, গ্লানিতে তিনি সাময়িক ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। এ ঘটনা হল ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা।

এরপর তাঁর এক বিশেষ বন্ধু কার্ডিনাল বারবেরিন পোপের পদে অভিষিক্ত হলেন। এবার তিনি ধূমকেতুর তত্ত্বের ওপর 'দি অ্যাসেয়ার' (The Asseyer) নামক একখানি গ্রন্থ লিখে নতুন পোপকে উৎসর্গ করলেন। এরপর সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ডায়ালগস্ কনসার্নিং দি টু প্রিন্সিপ্যাল সিসটেমস্ অব দি ওয়ার্ল্ড' (Dialogues concerning the two Principal Systems of the World) প্রকাশিত হল ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর বিগত চল্লিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধ্যান-ধারণাকে তিনটি প্রধান চরিত্রের কথোপকথনের ভঙ্গিতে এই গ্রন্থে স্থান দিলেন।

সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে অকাট্য যুক্তিজালে প্রাচীনপন্থী রোমান ক্যাথলিক যাজকমহল ক্ষিপ্ত হল। স্বয়ং পোপ গ্রন্থটির

প্রচার বন্ধ করলেন। কিন্তু, গ্যালিলিও যে ধর্মসংস্থার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন। তিনি পাপী! পাপীকে এবার সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। ১৬৩৩ সালের ২০শে জুন তাঁকে ডেকে পাঠান হল। পরের দিন ২১শে জুন রোমের ইনকুইজিশনের সামনে তার ধর্মদ্রোহিতার বিচার হবে। ইনকুইজিশন ছিল এক সাংঘাতিক বস্তু। এটি হল—রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিচারক-মণ্ডলীকে নিয়ে গঠিত বিচারসভা। তাঁরা অপরাধী ও পাপীদের সমুচিত শাস্তির বিধান দিতেন। তাঁদের বিচারে সত্তর বছরের বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে শাস্তি-ঘরে পাঠান হল। সে যুগে ইনকুইজিশনের শাস্তি-ঘরের নাম শুনলেই মানুষ ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠত। সেই শাস্তি-ঘর থেকে যারা একবার জীবিত অবস্থায় বাইরে আসতে পেরেছিল তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা আর বাইরে এসে বলতে পারেনি। তিনদিন পরে সেই বন্ধ ঘরের দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন গ্যালিলিও। সেদিনটা ছিল ২৪ জুন।

কী প্রকার নির্যাতন যে গ্যালিলিওকে সহ্য করতে হয়েছিল যাতে তিনি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন—তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব ভুল এবং ধর্মবিরুদ্ধ এই তত্ত্ব তিনি ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করলেন। এতেও, তিনি পরিত্রাণ লাভ করলেন না। এখান থেকে তাঁকে পাঠান হল রোমের কারাগারে। পরে ফ্লোরেন্সে তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হয়। এই অবস্থাতেই তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিটি রেখে যান। তখন তিনি অন্ধ, অবস্থা প্রতিকূল। সেই প্রতিকূল অবস্থাতেই মুখে মুখে বলে গ্রন্থটি শেষ করেন। 'বলবিদ্যা' সম্পর্কিত এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হল্যাণ্ডে। সেখান থেকেই গ্রন্থটি 'দুটি নূতন বিজ্ঞান সম্পর্কে কথোপকথন' (Dialogues concerning Two New Seiences) নামে প্রকাশিত হয়। আধুনিক

জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুঃসাহসীক প্রতিষ্ঠাতা গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সনে।

এই ১৬৪২ সালেই জন্ম হয় নিউটনের। গ্যালিলিওর অনুসন্ধিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির ভিত্তির ওপরেই এসে দাঁড়ালেন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী নিউটন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে গেলে কোপারনিকাস, টাইকোব্রাহে, কেপলার এবং গ্যালিলিও হলেন অপরিহার্য।

পর্ব—তৃতীয়

বিশ্ব, মহাবিশ্ব ও গ্রহ-উপগ্রহ

বিশ্ব ঃ গ্যালিলিও যে দূরবীন তৈরি করেছিলেন তা ছিল ছোট। সেই দূরবীন দিয়ে আকাশে তাকিয়ে গ্যালিলিও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ দেখিয়ে যান। পরে আরো অনেক বড় বড় দূরবীন তৈরি হয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তবু আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেও বিশ্ব বিষয়ে আমাদের ধারণা সঠিক ছিল না। তখন আমরা জানতাম বিশ্বের কেন্দ্র হল সূর্যের অবস্থান। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরছে। পৃথিবীও এমনি একটি গ্রহ। সূর্য একটি নক্ষত্র। নক্ষত্র দিয়ে গড়া বিশ্বের মাঝখানে রয়েছে সূর্য। বিশ্বের বাইরে যে আরও বিশ্ব আছে, মহাবিশ্ব আছে—এসব আমরা আগে জানতে পারিনি। জানতে পারি আজ থেকে প্রায় বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন আগে।

আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মস্ত এক দূরবীন বসালেন মাউণ্ট উইলসনে। সময়টা হল—১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। আর, এই দূরবীন দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন নক্ষত্র-মণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করলেন। তা থেকে বুঝতে পারা গেল সূর্য ও সৌরমণ্ডলের অবস্থানটি বিশ্বের কেন্দ্র নয়। বিশ্ব সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণাও গড়ে তোলা গেল।

আমরা যাকে বলি ছায়াপথ—তা হল এই বিশ্ব। এই বিশ্ব তারা দিয়ে গড়া। এই ছায়াপথে বা বিশ্বে রয়েছে দশ হাজার-কোটি তারা। এই তারাগুলি একটা চাকতির আকারে ছড়িয়ে আছে। তারা-গুলি সমান সমান দূরত্বে ছড়িয়ে আছে তাও নয়। সূর্য রয়েছে এই বিশ্বের কেন্দ্র থেকে অনেকখানি দূরে। চাকতিটি হল কুণ্ডলী

পাকান। আবার এই চাকতিটির দুটো কুণ্ডলী পাকান বাহুও রয়েছে। এবার, এই যে দশ হাজার-কোটি তারার সমন্বয়ে বিরাট এক দুই বাহু বিশিষ্ট কুণ্ডলী পাকানো চাকতির আকারের বিশ্ব— তা কতটা লম্বা, আর কতটা চওড়া ? আলোর গতি দিয়েই হিসাব করা যাক। আলোর গতি হল সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। এবার আলো যদি চাকতিটির ব্যাসের এ-প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে, তবে ও-প্রান্তে গিয়ে পেঁছাতে সময় লাগবে এক লক্ষ বছর। এ হল চাকতির বেড়। আর পুরুর দিক থেকে কেন্দ্রের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে আলো পেঁছাতে সময় হাগে ২০,০০০ বছর এবং ১,০০০ বছর লাগে বেড়ের কাছে।

আমাদের সূর্য তার গ্রহগুলি নিয়ে যেমন পাক খেয়ে চলেছে, তেমনি এই দশ হাজার-কোটি নক্ষত্র নিয়ে চাকতিরূপী বিশ্বও পাক খেয়ে চলেছে। চাকতির যেখানে সূর্যের অবস্থান, চাকতির কেন্দ্র থেকে সেখানে আলো পেঁছাতে সময় ২৫,০০০ বছর। আর সূর্যের কুড়ি কোটি বছর সময় লাগে চাকতির কেন্দ্রের চারদিকে একবার পাক খেতে।

আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারলো শাপলী দূরবীনের সাহায্যে তারামণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করে এইসব কথা বললেন।

মহাবিশ্ব ঃ আমরা যাকে বলি ছায়াপথ, তা হল বিশ্ব। এই বিশ্বেই আমাদের বসবাস। আমাদের এই বিশ্বের বাইরেও আরো অনেক অনেক বিশ্ব আছে। সেগুলি চেহারায় আমাদের এই ছায়াপথ নামক বিশ্বের মতই। আমাদের ছায়াপথের নানা জায়গায় আলোর ছোপের মত দেখা যায়। এগুলিকে আমরা নীহারিকার গ্যাস বলে থাকতাম। কিন্তু, এখন জানা গেছে তা নয় আমাদের বিশ্বের বাইরে এগুলিও এক-একটি বিশ্ব বা নক্ষত্র মণ্ডল। ইংরেজিতে একে বলে গ্যালাক্সি (Galaxy)। আমাদের বিশ্ব বা ছায়াপথও একটি গ্যালাক্সি। আমাদের বিশ্বের কাছে

যে বিশ্বটি রয়েছে, সেটি আকারে আমাদেরটির মতই দেখতে; কুণ্ডলী পাকানো দুই বাহু বিশিষ্ট চাকতির মত। আর আমাদের গ্যালাক্সি থেকে দূরত্ব ?—কুড়িলক্ষ বছর সময় লাগে আলো পেঁছাতে।

এই আবিষ্কার হল আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবলো শাপলী পরে। আবিষ্কার যিনি করেন তিনিও আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নাম তাঁর এডউইন হাবল (Edwin Hubble)।

তা হলে বিষয়টা দাঁড়াল—আমাদের তারা জগতের নাম হল ছায়াপথ (Milky Way)। এই ছায়াপথই হল আমাদের বিশ্ব। এতে রয়েছে আমাদের সৌরজগৎ সহ দশ হাজার-কোটি তারা। এর মধ্যে আমাদের পৃথিবী হল নগণ্য একটি গ্রহ। আর, আমাদের এই বিশ্বের বাইরে রয়েছে আরো অনেক, অনেক বিশ্ব—সংখ্যায় কোটি কোটি। এই কোটি কোটি বিশ্বকে নিয়ে যা কিছু, তাকে তো একটা নাম দিতে হয়। নাম দেওয়া হয়েছে মহাবিশ্ব বা 'ইউনিভার্স' (Universe)। আর এই আবিষ্কারগুলি হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে।

গ্রহ ঃ গ্রহগুলিকে নিয়ে হল সৌরজগৎ। সূর্যই হল এই সংসারের প্রধান। কোন গ্রহই তাকে ত্যাগ করে যেতে পারে না। সব গ্রহই সূর্যের সঙ্গে চিরকালের জন্যে বাঁধা আছে। গ্রহদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। যে যার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এবার সূর্যের এই পরিবারের অবস্থানগুলি দেখা যাক। সূর্য থেকে পর পর গ্রহগুলি হল—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ইত্যাদি। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে রয়েছে এক লক্ষের মত অতি ক্ষুদ্র গ্রহ। আর পৃথিবীর কাছাকাছি যে গ্রহগুলিকে ভাল করে দেখা যায়, তা হল—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি।

বুধ ঃ সব গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। বুধ

গ্রহ সূর্যকে বছরে চারবার (৮৮ দিনে একবার) প্রদক্ষিণ করে। বুধ তো সূর্যের সবচেয়ে কাছে, তাই চট করে চোখে পড়া কঠিন। কারণ সূর্য হল প্রচণ্ড উজ্জ্বল। গোধূলি বেলায় সূর্যের কিরণে জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল একটা ছোট তারা দেখা যায়। সেটিই হল বুধ। একে আমরা কখনো বলি 'ভোরের তারা' আবার কখনো 'শুকতারা'। খুব বেশিক্ষণ এটি আকাশে থাকে না। যেন সূর্যের পিছনে পিছনে ছুটে চলেছে আবার কখনো সামনে। কখনো আবার যখন সকাল বেলাতেও দেখা যায়—উষার কিরণ তখন দেখা দিলেই আর তাকে আকাশে দেখা যায় না। প্রাচীনকালে গ্রীকেরা এই গ্রহটির নাম দিয়েছিলেন 'মার্কারি'।

বুধ গ্রহ সূর্যের খুব কাছে। তাই এই গ্রহ থেকে সূর্যকে খুব বড় দেখায়। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যত বড় দেখা যায়, বুধ গ্রহ থেকে দেখা যাবে তার তিনগুণ বড়। বুধের তাপমাত্রা প্রচণ্ড। যে দিকটায় সূর্যের আলোকে আলোকিত সেখানে ৪০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। তবে এই তাপ তিলমাত্র স্থায়ী হয়।

সূর্যের এত কাছে বুধ, প্রচণ্ড তার তাপ। সুতরাং সেখানে জল এবং বায়ু থাকা অসম্ভব। কবে হয়ত যা ছিল—সব মহাকাশে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আছে শুধু শুকনো পাথর আর পাথর।

আবার বুধের উল্টো পিঠে—যেখানে সূর্য দিগন্তে মিলিয়ে গেলে নেমে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকার তো থাকবেই। বুধের যে নিজস্ব চাঁদ নেই। শুধু কী সেখানে অন্ধকার? ভয়ংকর ঠাণ্ডাও, হিমাঙ্কের ১৫০° নিচে সেখানের তাপমাত্রা। এমনকি এর চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে এই তাপমাত্রা ধীরে ধীরেই নেমে আসে, সূর্য অস্ত গেলে ধীরে ধীরে নেমে আসে। বুধ গ্রহ সেকেণ্ডে ৪৮ কি মি বেগে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। অন্য কোন গ্রহের গতিবেগ এত বেশি নয়। বুধ গ্রহের কক্ষপথ হল চ্যাপ্টা ধরনের উপবৃত্ত। তাই সূর্য থেকে কাছে থাকে, দূরত্ব হল

৪·৬০ কোটি কিলোমিটার। আর, যখন দূরে থাকে তখন দূরত্ব হল ৬·৯৮ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের কাছে থাকলে এর গতিবেগ বেশি হয় আর, দূরে থাকলে গতিবেগ কমে যায়। তেমনি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছে এলে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর পাক খায় দ্রুত এবং দূরে চলে গেলে পাক খাওয়ার গতি যায় কমে। পৃথিবীর কথা আর চাঁদের কক্ষ এক সমতলে নয়। এই দুটি কক্ষতলের জল সাত ডিগ্রী কোণাকুণিতে।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে বুধের অনেক মিল আছে। বুধ চাঁদের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বড়। বুধের ব্যাস হল ৪,৮৮০ কিলোমিটার, চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৬ কিলোমিটার। চাঁদে যেমন খাড়া-পাহাড়, গুহা, খানা-খন্দর, গহ্বর—বুধেও তেমনি।

বুধ গ্রহের কক্ষ চ্যাপ্টা ধরনের উপবৃত্ত হওয়ায় যখন গ্রহটি সূর্যের কাছে আসে তখন কোন কোন জায়গা থেকে মনে হবে সূর্য পশ্চিম থেকে পূবে চলেছে। সূর্যের অবস্থান হবে দিগন্ত রেখায়। মনে হবে অস্ত যাচ্ছে, নয়তো উদয় হচ্ছে। এখানেই এইভাবে উদয় হওয়ার পরে এখানেই অস্ত যাবে। যেন একটু মুখ দেখিয়েই চলে গেল। আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিগন্তের ওপরে উঠে আবার অস্ত যাবে। এভাবে দুবার উদয় হবে দুবার অস্ত যাবে। পৃথিবীর ৮৮ দিনে বুধ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তাই বুধের হিসাবে এই ৮৮ দিনেই বছর। আর বুধের হিসাবে সূর্য প্রায় সারা বছর আকাশে থাকে।

শুক্র ঃ সূর্য থেকে দ্বিতীয় গ্রহ হল শুক্র। ভোরের এবং সন্ধ্যার আকাশে এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিকে দেখা যায়। সূর্য এবং চাঁদকে বাদ দিলে এত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশে আর একটিও নেই। ভোরের আকাশে একেই আমরা 'শুকতারা' বলি।

সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব ১০ কোটি ৮২ লক্ষ কিলোমিটার। শুক্রের কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার। পৃথিবীর দিনের হিসাবে শুক্র ২২৫

দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের জ্যোতিষ্ক। শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে পৃথিবী থেকে দূরত্ব হয় ৪·২ কোটি কিলোমিটার আর সবচেয়ে দূরে গেলে হয় ২৫·৮ কোটি কিলোমিটার।

শুক্র ও পৃথিবী—এই দুটি গ্রহের আকার প্রায় সমান-সমান। বিষুববৃত্তে শুক্রের ব্যাস হল ১২,৩০০ কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাস হল ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। এই দুটি গ্রহের মহাকর্ষ ও ভরেও যথেষ্ট মিল রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে শুক্রের রয়েছে প্রচণ্ড অমিল।

শুক্রের ওপরে রয়েছে খুব ঘন, গাঢ় বায়ুমণ্ডল। সেই বায়ু-মণ্ডল এতই গাঢ় যে সাদা তুলোর মত মেঘে যেন শুক্র গ্রহ জড়ানো রয়েছে। আর, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে যা দেখা যায়, তা হল গ্রহটির বাইরে যে ঘন মেঘের আবরণ রয়েছে তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা সূর্যের আলো।

শুক্র গ্রহের মেঘের ভিতরে কী আছে তা পৃথিবী থেকে জানা এতকাল সম্ভব হয়নি। কারণ সে মেঘ একেবারে নিশ্ছিদ্র। তবে, সোভিয়েত ও আমেরিকার বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় রকেটের সাহায্যে শুক্র গ্রহে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চাঁদের কলার মত শুক্র গ্রহের কলা আছে, নিজের তৈরি দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে গ্যালিলিও একথা বলেছিলেন। শুক্রের আর চাঁদের কলার নিয়ম-কানুন একই। শুক্রের অন্ধকার দিকটা যখন পৃথিবীর দিকে থাকে তখন শুক্রের অমাবস্যা-চাঁদের মত। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রকলার মত বড় হতে হতে পুরোটা প্রকাশ পায়। চাঁদ পুরোটা প্রকাশ পেলে হয় পূর্ণিমা। আর, শুক্র পুরোটা প্রকাশ পাওয়া অবস্থায় যখন থাকে, তখন সে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে—২৫·৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। শুক্র

যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, তখন তার ফালি-অবস্থা। এই ফালি-অবস্থাতেই শুক্র আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা।

শুক্রের অক্ষ-আবর্তন বিষয়ে নানাপ্রকার মত ছিল। তবে, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রেডার পদ্ধতিতে সঠিক মাপ নির্ণয় করেছেন। পৃথিবীর দিনের হিসাবে ২৪৩ দিনে শুক্র নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খায়। শুক্র বাদে অন্যান্য গ্রহগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পাক খায়। কিন্তু শুক্র ঠিক তার উল্টো—শুক্র পাক খায় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ, শুক্রে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে এবং পূর্ব দিকে অস্ত যায়। নিজের অক্ষে পূব থেকে পশ্চিমে পাক খেতে খেতে শুক্র পৃথিবীর হিসাবে ২২৫ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। হিসাবে দেখা যায়—শুক্র গ্রহে একদিন হল পৃথিবী গ্রহের ১১৮ দিন। অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেখানে চার মাস, তখন শুক্রে একদিন আর একরাত। শুক্রের বছর হল ২২৫ দিনে। আর এই ২২৫ দিনে শুক্রে পুরোপুরি দুটো দিন আর দুটো রাতও হয় না।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বহু অনুসন্ধানী ব্যোমযান শুক্র গ্রহে পাঠান হয়েছে, বহু তথ্যও শুক্র গ্রহের বিষয়ে পাওয়া গেছে। ভেনেরা-১৩ এবং ভেনেরা-১৪ শুক্র গ্রহের রঙীন আলোকচিত্র তুলে পাঠিয়েছে। এ-থেকে শুক্র বিষয়ে নতুন করে অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আদিতে পৃথিবীর যে রূপ ছিল—শুক্রের রূপও তেমনি। তবে পৃথিবীতে মহাসাগর যদি না থাকত, তবে যেমনটি দেখতে হতো, শুক্রের উপরিভাগও তেমনি দেখতে। পৃথিবীর আগ্নেয়শিলার মত রূপ হল শুক্রের শিলার। শুক্রগ্রহে কোন প্রাণ নেই, মহাসাগরও নেই। শুক্র গ্রহের রঙীন আলোকচিত্র থেকে দেখা যায়, শুক্রের আকাশ কমলা রঙের।

শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস।

এই গ্যাস উত্তাপকে ধরে রাখে। ফলে শুক্রের উত্তাপ খুব বেশি। বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকের উত্তাপ ৫০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। শুক্র গ্রহের আকাশে যে বায়ুমণ্ডল, তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় শুক্রের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় একশত গুণ বেশি। আদিতে পৃথিবীর আকাশে যেমন প্রচণ্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা ছিল—ঠিক যেন তেমনি। তবে, পৃথিবীতে ছিল সাগর, শুক্রে তা নেই। শুক্রে দিন রাত সব সময়েই একই উত্তাপ থাকে।

পৃথিবীতে থেকে শুক্রে যে সাদা তুলোর মত মেঘের আবরণ দেখা যায়, তা খুবই ঘন। এই মেঘ শুক্রের মাটি থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উঁচুতে। আবার খাড়া দিকে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে অত্যন্ত ঘন হয়ে। এই মেঘ স্তরে স্তরে বিভক্ত হয়ে আছে। এইসব ঘন মেঘের স্তরে রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘন জলীয় দ্রবণ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং আরও অন্যান্য অনেক রকম অ্যাসিড। এইসব পদার্থ নিয়ে হল শুক্র গ্রহের মেঘমণ্ডল। এই মেঘের স্তরের নিচে হল শুক্রের বায়ুমণ্ডল।

শুক্রের উত্তাপ খুব বেশি—৫০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এত অধিক উত্তাপে সেই গ্রহের নানাপ্রকার পদার্থ গলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ বহু পদার্থের গ্যাসীয় আকারে অবস্থান দেখা যায়। শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলে যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গ্যাস রয়েছে, সেগুলি গতিবেগ-সম্পন্ন—চলাফেরা করে। আর, উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—গ্রহটির উপরিতলে সব সময়েই সব জায়গাতেই একই তাপমাত্রা, কি দিনে কি রাতে—সব সমান।

মঙ্গল ঃ পৃথিবীর পরের গ্রহটি হল মঙ্গল। মঙ্গলের অধিকাংশ জায়গা আলোকিত এবং গাঢ় লালচে। এই মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আমাদের অনেক কল্পনা ছিল। সেসব খুব বেশিদিন

আগেকার কথা নয়। পৃথিবীর মানুষের ধারণা ছিল, মঙ্গল গ্রহে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান কোন জীব বাস করে। ১৯৭৬ সালে 'ভাই কিং-১' এবং 'ভাই কিং-২' নামে দুটি মার্কিন স্বয়ংক্রিয় স্টেশন মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে। সেই গ্রহে সত্যই কোন প্রাণ আছে কি নেই, এই ছিল স্বয়ংক্রিয় স্টেশন দুটির কাজ। এই স্টেশন দুটি আলোক চিত্র তুলে, মঙ্গলের মাটি ও মরুভূমির বালি পরীক্ষা করে যে তথ্য পাঠিয়েছে তাতে দেখা যায় মঙ্গলের মাটির ওপর কোন জীবন্ত কিছু নেই। তবে, মঙ্গলের মাটির তলায় কী আছে, না আছে—তা জানা যাবে ভবিষ্যতে।

মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ হল উৎকেন্দ্রিক। সূর্য থেকে যখন সবচেয়ে দূরে থাকে, সে দূরত্ব হল ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার আয় যখন সবচেয়ে কাছে থাকে, সে দূরত্ব হল ২০ কোটি ৭২ লক্ষ কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর হিসাবে ৬৮৭ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলে ঋতু পরিবর্তন হয়। মঙ্গলের ঋতু-পরিবর্তনের কারণ হল—মঙ্গল তার লক্ষ তক্ষতলে ২৪° ডিগ্রী হেলানো রয়েছে। পৃথিবীর যেমন রয়েছে ২৩½° ডিগ্রী। মঙ্গল সূর্যের যখন কাছে আসে তখন তার দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আর, সূর্যের কাছে এলেই চক্রবেগ বেশি হয়ে যাওয়ার দরুন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল যেমন স্বল্পস্থায়ী হয়, তেমনি গরম ও হয় বেশি। ঠিক তেমনি মঙ্গলে শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী আর শীতকালে ঠাণ্ডাও বেশি। সব মিলিয়ে মঙ্গল গ্রহ হল ঠাণ্ডার দেশ। গ্রীষ্ম-কালের তাপমাত্রা ২০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থেকে যায়। আর, মঙ্গল গ্রহের রাতে নেমে আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে চলে আসে।

মঙ্গল তার নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২·৬ সেকেণ্ড। মঙ্গলের আকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের মত। মঙ্গলের ব্যাস হল ৬,৭৯০

কিলোমিটার, আর পৃথিবীর ব্যাস হল ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। এই পরিমাণে মঙ্গলের ভর, অভিকর্ষ কক্ষপথে ছুটের বেগ সবই পৃথিবীর চেয়ে কম।

মঙ্গল গ্রহ নিয়ে নানা কারণে আমাদের প্রচুর জল্পনা-কল্পনা ছিল। কিন্তু মঙ্গলে গ্রহ-অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠানোর পর নানাপ্রকারে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ হয়েছে বহু তথ্যও জানা গেছে।

মঙ্গল গ্রহে সমুদ্র নেই, জল নেই। তবে, পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহে একটি বায়ুমণ্ডল আছে। তবে সে বায়ুমণ্ডল খুবই হালকা। তার চাপও খুব কম। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে গ্যাস-মুখোশ ছাড়া সেখানে থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলে বায়ুর বেগ প্রচণ্ড—ঘণ্টায় প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার। কিন্তু, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের চাপের দু-শ ভাগের এক ভাগ। এতই পাতলা যে বায়ু যে কোন ডানাওয়ালা প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে সম্ভব হতে পারে না। মঙ্গলের বায়ু-মণ্ডলে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন, সামান্য কিছু পরিমাণে অক্সিজেনের ও হাইড্রোজেনের অণু এবং আর্গন। বিজ্ঞানীরা মনে কনের—অক্সিজেনের পরমাণু মঙ্গলের মহাকর্ষের টান ছিঁড়ে হয়ত উধাও হয়ে গেছে মহাকাশে। পৃথিবীর অভিকর্ষ মঙ্গলের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গল গ্রহে রয়েছে সীমাহীন বালির মরুভূমি আর তাতে বড় পাথর-বালিতে ঢেকে আছে। এই মরুভূমির রঙ বাদামী-লাল। মঙ্গলের আকাশ মেঘহীন, হাল্কা লালচে। মঙ্গলের রয়েছে মৃত সব আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়। মঙ্গলের শিলা হল—আগ্নেয়-শিলা। বহু গবেষণা করে দেখা গেছে, মঙ্গলের মাটিতে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। শুক্রগ্রহের মত মঙ্গলেরও চুম্বকত্ব নেই। এথেকে

প্রমাণ হয় মঙ্গলের বস্তুপিন্তে কেন্দ্রে কোন ধাতু গলিত অবস্থায় নেই। মঙ্গল গ্রহে পাঠান ব্যোমযানগুলি এইসব তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে। এদের গ্রীক নাম হল—ফোবোস ও ডাইমোস। গ্রীকদের এক যুদ্ধের দেবতা আছে। তার যে রথ সেই রথের ঘোড়া দুটির নাম হল—ফোবোস ও ডাইমোস। 'ফোবোস' কথার অর্থ—ত্রাস, 'ডাইমোস' কথার অর্থ—শঙ্কা।

উপগ্রহ দুটি আকারে খুবই ছোট। শক্তিশালী দূরবীণ ছাড়া পৃথিবী থেকে দেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত কেপ্‌লারই বলেছিলেন, মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ থাকতে পারে। উপগ্রহ দুটির ব্যাস যথাক্রমে ১৬ কিলোমিটার এবং ৮ কিলোমিটার। মঙ্গলের এই দুটি বৃত্তাকার কক্ষযুক্ত উপগ্র যথাক্রমে ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে এবং ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে গ্রহকে একবার পাক খেয়ে আসে। সৌরমণ্ডলে এই দুটি উপগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলগ্রহে প্রেরিত বোমযান 'মেরিনার' এবং 'ভাইকির' উপগ্রহ দুদিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে ছবি তুলে পাঠিয়েছে। তাতে দেখা যায় গ্রহ দুটিতে রয়েছে প্রচুর গহবর এবং উপগ্রহ দুটি গ্রহটির এত কাছে যে গ্রহের মেরু অঞ্চল থেকে তাদের কখনো দেখা যায় না।

বৃহস্পতি ঃ সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ হল বৃহস্পতি। সূর্য থকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। সূর্য থেকে বুধের অবস্থান হল প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার দূরে, শুক্রের রয়েছে প্রায় ১১ কোটি কিলোমিটার দূরে, পৃথিবীর প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে এবং মঙ্গলের অবস্থান হল প্রায় ২৩ কোটি কিলোমিটার দূরে। অথচ বৃহস্পতির অবস্থান হল ৭৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব বিষয়টা নিয়ে কেপ্‌লার মাথা ঘামিয়েছিলেন। মঙ্গলগ্রহ থেকে বৃহস্পতিগ্রহ এত দূরে কেন?

নিশ্চয়ই এখানে অন্য কিছু আছে। তিনি খুঁজেছিলেন—কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারেন নি। পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে শক্তিশালী দূরবীন। তাঁরা দেখলেন এখানে রয়েছে লাখখানেক টুকরো-টুকরো বস্তুপিণ্ড। সেগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। হয়ত এককালে কোন গ্রহই ছিল, বিজ্ঞানীদের অজানা কোন কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাঁরা এই বস্তুপিণ্ডগুলির নাম দিয়েছেন 'গ্রহাণু' (Asteroid)।

বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল এই তিনটি গ্রহে ব্যোমযান নামানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহে ব্যোমযান নামানো সম্ভব হয়নি। তবে অনুসন্ধানী ব্যোমযানগুলি বৃহস্পতি গ্রহের যেসব তথ্য পাঠিয়েছে, তার সবই হল গ্রহটির বাইরের দিকের—ভেতরের খবর বিশেষ কিছু নেই। তবে এই ব্যোমযানগুলির (চারটি) মধ্যে 'ভয়েজার—১' এবং 'ভয়েজার—২' থেকে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতির গড়ন সম্পর্কে অনেক কিছুই সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে।

সৌরমণ্ডলের বড় বড় গ্রহগুলি৭ মধ্যে বৃহস্পতিই সবচেয়ে বড়। বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ বেশি। আয়তনেও পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণের বেশী। কিন্তু ভর হল পৃথিবীর চেয়ে ৩১৮ গুণ বেশী। বুধ, শুক্র পৃথিবী ও মঙ্গল—এই চারটি গ্রহ থেকে বৃহস্পতির গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আমরা বৃহস্পতির শুধু মাত্র বাইরে বায়ুমন্ডলটুকু দেখতে পাই। সেখানে রয়েছে বিপুল পরিমাণে বিরাট এলাকা জুড়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ঘন এক বায়ুমণ্ডল।

বৃহস্পতিকে 'ক্ষুদে তারা' বা 'ক্ষুদে সূর্য' বলা হত কয়েক দশক আগেও। তার বিশেষ কারণ আছে। তবে, এখন আর কেউ তা বলেন না। বৃহস্পতির উপরিভাগের তাপমাত্রা ১২০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত। কিন্তু গোলকের কেন্দ্রীয় এলাকার তাপমাত্রা

প্রচণ্ড—পাঁচলক্ষ ডিগ্রির কাছাকাছি। আর, এই বৃহস্পতি গ্রহ সূর্য গেকে যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে থাকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ শক্তি মহাশূন্যে নিঃসরিত করে। তবে, আগেকার দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ বৃহস্পতি গ্রহকে এইসব কারণে যে 'ক্ষুদে তারা বলতেন, তা নয়। তারা বৃহস্পতির বিরাট আকার দেখেই বলতেন। কিন্তু, গ্রহ ও তারা বা নক্ষত্রের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য আছে। পৃথিবী থেকে হাজার-হাজার গুণ বড় গ্রহ হলেও তা কখনো নক্ষত্র নয়—গ্রহ —গ্রহই থাকে।

গ্রহ আর নক্ষত্রের তফাত নির্ভর করছে ভরের ওপর। ধুলো আর গ্যাসের মেঘ মহাকর্ষের টানে যখন জমাট বাধতে থাকে তখন কণিকার সঙ্গে কণিকার সংঘর্ষে ভিতরের উত্তাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে ১·৪ কোটি সেণ্টিগ্রেডে যখন পেঁছায় তখন পারমাণবিক ক্রিয়ার ফলে তা জ্বলে ওঠে। এইভাবে জন্ম হয় নক্ষত্রের। বৃহস্পতির ভর এত বেশি নয় যে এই গ্রহটি তারায় পরিণত হতে পারে।

বৃহস্পতি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় লাগে ১১·৮৬ বছর। প্রায় সারা বছর ধরেই বৃহস্পতিকে আকাশে দেখা যায়। সূর্য থেকে বৃহস্পতির গড় দূরত্ব হল ৭৭ কোটি ৩৩ লক্ষ কিলোমিটার। বৃহস্পতি গ্রহটি পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে, পৃথিবী থেকে তার কোন কলা দেখা যায় না। তবে, পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির উজ্জ্বল চাকতি আর তার গায়ে পর-পর কতকগুলি ধূসর বলয় যে ভালভাবে দেখা যায়। ভেতরের দিকে যে চারটি উজ্জ্বল উপগ্রহ রয়েছে, তাও দেখা যায়। বৃহস্পতির চাকতিটি উপবৃত্তাকার এবং পুরো গোল না হয়ে খানিকটা চ্যাপ্টা। নিজের অক্ষের ওপর বৃহস্পতি অতি দ্রুত বেগে আবর্তিত হয়ে চলেছে বলেই হয়ত এমনটি দেখা যায়।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড আলোড়ন চলে। আর, এই

আলোড়নের ফলে গ্রহটির উপরিভাগে যেরূপ প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী থেকে আমরা তাই দেখে থাকি।

বৃহস্পতির বিষুববৃত্তের সমান্তরালে কতকগুলি ধূসর বাদামী ও লাল রঙের বলয় আছে। সমান্তরালের বলয়টি হলুদ রঙের। সবসময় এগুলি একই চেহারার থাকে না। কখনো চওড়া বেশি, কখনো কম। আবার কখনো উজ্জ্বলতা বেশি, আবার কখনো উজ্জ্বলতা কম। রঙের দিক থেকে এক-এক সময়ে এক-এক রকম। নানা রঙ—লাল, কমলা, বাদামী, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনী ইত্যাদি সব রঙ এই বাদামী-লাল বলয়ের ওপর দেখা যায়। কেন এই ধরনের রঙের বদল হয়, তার কারণ সঠিকভাবে এখনো নির্ণয় করা যায়নি। বৃহস্পতি গ্রহের উপরিভাগে একটা বিরাট লাল ছোপ দেখা যায়। যার নাম গ্রেট রেড স্পট্'। এটি লম্বা প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার। এবং চওড়ায় প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটার। মার্কিন বিজ্ঞানীদের পাঠানো 'অ্যাপোলো' নামক ব্যোমনানের পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেছে এই এলাকাটি হল বৃহস্পতি গ্রহের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের এলাকা। এলাকাটির আকৃতি ডিম্বাকার, অবস্থান হল—বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধে ট্রপিক বলয়ে।

নিজের অক্ষের চারদিকে বৃহস্পতির দ্রুত আবর্তন। কিন্তু, এই আবর্তন বিষুব এলাকায় এক রকম আবার মেরুর দিকে এক রকম। এ কী করে সম্ভব। কোন কঠিন পদার্থই এভাবে আবর্তিত হতে পরে না। তবে নিশ্চয়ই বৃহস্পতি গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। এই গ্রহ ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারের অধিক বেগে আবর্তিত হচ্ছে বলে ওপরের আর নিচের দিকটা চাপা এবং পেটটি মোটা দেখায়।

বৃহস্পতির চৌম্বক-ক্ষেত্র খুবই জোরালো। এই গ্রহটি থেকে

রেডিও তরঙ্গও বিকিরিত হয়। এই রেডিও তরঙ্গ ১৩ মিটার এবং ১০ সেণ্টিমিটার ব্যাণ্ডে বিকিরিত হয়ে থাকে।

পৃথিবী থেকে পাঠান চারটি ব্যোমযান বৃহস্পতি গ্রহের কাছ থেকে হাজার হাজার ছবি তুলে পাঠিয়েছে। তবে, এইসব ছবি বৃহস্পতির উপরিতলের। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ব্যোমযানের ক্যামেরা ছবি তুলতে সক্ষম হয়নি। এইসব ছবি থেকে এবং পাঠান তথ্য থেকে নির্দিষ্টভাবে অনেক কিছুই জানা গেছে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে সব সময়েই চলেছে প্রচণ্ড ঝড়। বিষুব এলাকায় এই ঝড়ের দাপটে মেঘগুলি ঘণ্টায় ৩৬০ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে রয়েছে, মিথেন অ্যামোনিয়া, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদির মিশ্রণ। আর এই সব গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেনের ভাগটাই সবচেয়ে বেশি। বৃহস্পতির মেঘ গড়ে উঠেছে বিশেষতঃ মিথেন, অ্যামোনিয়া, হিলিয়ামের মিশ্রণে। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ হল বৃহস্পতির ভর প্রচণ্ড। এই ভরের জন্যেই বৃহস্পতি গ্রহে গোড়ায় যত হাইড্রোজেন ছিল, সবই রয়ে গেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা হল—বৃহস্পতির কেন্দ্রে রয়েছে ধাতু ও শিলা। এই ধাতু ও শিলার স্তরের ওপরে আছে ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর। এই স্তরের ওপরে কঠিন অথবা তরল হাইড্রোজেন। এবং সব কিছুর ওপরে রয়েছে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল। এইসব স্তরগুলি মিলে বৃহস্পতির ব্যাস হল ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার। তবে, এসবই হল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। কারণ, ব্যোমযান প্যায়োনিয়ার—১০', 'প্যায়োনিয়ার—১১', 'ভয়েজার —১' এবং 'ভয়েজার—২' বৃহস্পতি গ্রহের ভিতরের কোন তথ্য পাঠাতে সক্ষম হয়নি।

বৃহস্পতি গ্রহের চোদ্দটি (পরে আরও একটি) উপগ্রহের

সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে চারটি আকারে বড়, অন্যগুলি খুবই ছোট। এই বড় চারটি উপগ্রহ আকারে চাঁদের চেয়ে বড় এবং খুবই উজ্জ্বল। গ্যালিলিও ১৬১০ সালে তাঁর দূরবীন এই বড় চারটি উপগ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন। এই গ্রহগুলি হল 'ইও' (Io), 'ইউরোপা' (Europa), 'গ্যানিমিড' (Ganymede), এবং 'কালিস্টো' (Callisto)। মার্কিন স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান 'পাইওনীয়র' এবং 'ভয়েজার' বৃহস্পতির পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় এই উপগ্রহগুলির বিষয়ে খুবই কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য পাঠিয়েছে।

'ইও' হল অনেকটা কালচে বাদামী বা 'মরচে' রঙের উপগ্রহ। এর ভেতরটা এখনও খুবই উত্তপ্ত রয়েছে বলে ধারণা। সেখানে সব সময় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ চলছে।

'ইউারাপো' উপগ্রহটি হল সাদা-সোনালী রঙের। বেশ সমান পালিশ করে মসৃণ করার মতন। কিন্তু উপগ্রহটি আগাগোড়া চিড় খাওয়া।

সবচেয়ে বড় উপগ্রহটি হল 'গ্যানিমিড'। এর রঙ কালো এবং সারা দেহে সাদা সাদা দাগ রয়েছে। ছবি দেখে মনে হয় উপগ্রহটি যেন কঠিন বরা দিয়ে তৈরি, তার ওপরে যেন একটা কালো খোসা এবং তার ওপরে কেউ যেন কোন কিছু দিয়ে মেরে সাদা সাদা দাগ করে দিয়েছে।

'কালিস্টো' উপগ্রহটির আকারও প্রকাণ্ড। এর রঙ খয়েরি। এটি দেখে মনে হয়, যেন একেবারে ভাঙাচোরা। সমস্ত উপগ্রহটিতে গর্ত আর গর্ত, ক্ষতবিক্ষত এইসব গর্তে গর্তে।

যদি কোন ব্যোমযান বৃহস্পতি গ্রহে অবতরণ করান হয়, তবে তাকে প্রথমে 'ইও' উপগ্রহে নামতে হবে। 'ইও'-ই হল সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ। এখান থেকে বৃহস্পতিকে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে।

শনি ঃ বৃহস্পতির পরের গ্রহ হল শনি। বৃহস্পতির সঙ্গে শনির খুব মিল রয়েছে। বৃহস্পতি গ্রহটিকে যেমন মস্ত এক মেঘের গোলা বলে মনে হয়, শনিকেও ঠিক তেমনি মনে হয়। এই মেঘের গোলার ভেতরে আছে শক্ত শাঁস। তবে শনি বৃহস্পতির মত তত উজ্জ্বল গ্রহ নয়।

শনিকে ঘিরে আছে একটা বেড় বা বলয়। বেশ জমকাল দেখতে বলে মনে হয়। আর, এই বলয় আছে বলেই শনিগ্রহের ভেতরের দিকে নজর চট করে যায় না। তবে এই বলয় কোন শক্ত পাতলা বা চ্যাপ্টা বেড় নয়। বলয় আবার একটা নয়—তিনটে। প্রথম বলয়টির রঙ খানিকটা পাঁটকিলে সাদা উজ্জ্বল নয়। প্রথম বলয় থেকে খানিকটা ফাঁকে রয়েছে দ্বিতীয় বলয়টি। দ্বিতীয় বলটির রঙ নীলচে ধূসর। দ্বিতীয় বলয়টির গায়ে গায়েই রয়েছে তৃতীয় বলয়টি। শনির বলয় তিনটির বাইরের দিকের ব্যাস হল ২,৭২, ৩০০ কিলোমিটার। প্রথম বলয়টি চওড়া হল ১৬,৩৫০কিলোমিটার। দ্বিতীয় বলয়টি ২৬,৫৫০ কিলোমিটার চওড়া। তৃতীয় বলয়টি চওড়া হল ১৫,৯০০ কিলোমিটার। আর, শনিগ্রহের উপরিতলের সঙ্গে তৃতীয় বলয়টি ফাঁক রয়েছে ১৫,০০০ কিলোমিটার। এই ফাঁকটা কিন্তু খুব কম নয়, পৃথিবীকে এই ফাঁকের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া চলে। তবে, এই বলয়গুলি যত চওড়াই হক না কেন, পুরু খুব কম— ধারণা করা হবে বলয়গুলি ১০ কিলোমিটারের চেয়ে পুরু নয় বলে।

শনির এই বলয় কিভাবে যে সৃষ্টি হল—তা সঠিক বলা যায়নি। শনির এই বলয়ের উপাদান হল অতি সূক্ষ্ম ধূলোর কণা থেকে শুরু করে টুকরো টুকরো পাথর। এইসব কিছুই প্রচণ্ড বেগে ঘুরে চলেছে শনি গ্রহের চারদিকে। পাথরে পাথরে লাগছে ঠকাঠুকি। বড় যত পাথর ঠুকে ঠুকে পরিণত হচ্ছে ছোট পাথরে। ছোট পাথর ধূলিকণায়। এই বলয়ের চক্রবেগ কাছেরটির, অর্থাৎ ভেতরেরটি যত দ্রুত—বাইরের দিকেরটির তত কম।

শনির এই বলয় কিভাবে উদ্ভব হল? সে বিষয়ে অনেকে বলে থাকেন, কোন একদিন হয়ত শনির কোন উপগ্রহ মহাকর্ষের টানে শনিগ্রহের খুব কাছে চলে এসেছিল। এমন অবস্থায় যদি কোন উপগ্রহ এসে উপস্থিত হয়, তবে সামনের দিকে যেমন প্রচণ্ড টান শুরু হয়, তেমনি পেছনের দিকটা দূরে থাকায় টান পড়ে কম। এই প্রচণ্ড দোটানায় পড়ে উপগ্রহটি হয়ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

ইউরেনাস: শনির পরের গ্রহ হল ইউরেনাস। ইউরেনাস গ্রহের প্রভা কম হলেও একে খালি চোখে দেখা যায়। শনির চেয়ে আকারে ছোট হলেও গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। বিষুব এলাকায় ইউরেনাস গ্রহের ব্যাস হল ৪৩,১০০ কিলোমিটার, আর মেরু এলাকায় হল ৪৩,৮০০ কিলোমিটার। ইউরেনাসের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি, ভর বেশি সাড়ে চোদ্দগুণ। ইউরেনাস গ্রহের বৈশিষ্ট্য হল এর উপরিতল শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের মত গ্যাসের আবরণে ঢাকা।

ইউরেনাস শনি ও বৃহস্পতির মত নিজের অক্ষের ওপর অতি দ্রুত পাক খেয়ে চলেছে। ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট নিজের অক্ষের ওপর একবার পাক খেতে খেতে ইউরেনাস সূর্যকে ৮৪ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। আর একটি অদ্ভুত বিষয় হল, ইউরেনাস গ্রহ নিজের কক্ষতলের ওপর অন্যান্য গ্রহদের মত একটু হেলে নেই—আছে প্রচণ্ড হেলে, হেলে আছে ৯৮° ডিগ্রী। এই এক সমকোণের চেয়েও ৮° ডিগ্রী বেশি হেলে থাকার জন্যে আমরা দেখি গ্রহটি পূব থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে পাক খেয়ে চলেছে।

ইউরেনাসের উপগ্রহও আছে। এরর উপগ্রহের সংখ্যা হল পাঁচটি। ১৯৭৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন; ইউরেনাসের বলয় আয় আছে। পরে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান 'অ্যাপোলে

—১১'-র সাহায্যে জানা যায় ইউরেনাসের বলয়ের সংখ্যা হল নয়টি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনাস এই তিনটি গ্রহ গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। আর, এই তিনটি গ্রহেরই বলয় আছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, গ্রহ যদি এই তিনটি গ্রহের মত গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, তবে তাদের বলয় থাকা স্বাভাবিক কিনা।

নেপচুন ও প্লুটো ঃ ইউরেনাসের পরে এক বেশ বড় গ্রহ হল নেপচুন। ইউরেনাস থেকে দূরত্ব বহুকোটি কিলোমিটার। ১৮৪৬ সালে গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়। নেপচুন গ্রহের পৃথক কোন বিশেষত্ব নেই। এই গ্রহটি বৃহস্পতি ও ইউরেনাসের মতই।

নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কারের পেছনে একটি কাহিনী আছে। গণিতবিদ আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো ইউরেনাস গ্রহটিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁরা দেখলেন ইউরেনাস নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যেন একটু সরে সরে যাচ্ছে। তাই তাদের অঙ্কে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে। কারণটি হচ্ছে—প্রতিটি গ্রহ প্রতিটি গ্রহকে আকর্ষণ করে টানে। এই যেমন আমাদের পৃথিবীকে টানছে শুক্র মঙ্গল, বৃহস্পতি —এইসব গ্রহ। তেমনি ইউরেনাসকে টানছে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ। তবুও হিসাবে গড়মিল থেকে যাচ্ছে। তবে তো নিশ্চয়ই অজানা কোন গ্রহ ইউরেনাসের পরে রয়েছে, যা টান রেখে চলেছে ইউরেনাসকে। সত্যিই তা একদিন প্রমাণিত হল। নতুন গ্রহটি আবিষ্কৃত হল ১৮৪৬ সালে। এই গ্রহটিই হল নেপচুন।

নেপচুন সূর্য থেকে ৪৫০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। খালি চোখে নেপচুনকে দেখা যায় না। নেপচুন ১৬৪ বছর ৯ মাসে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। আর ১৫৮ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের ওপর একবার পাক খায়।

নেপচুনের দুটি উপগ্রহ আছে। একটির নাম 'ট্রাইটন' (Triton), অন্যটির নাম 'নিরিইদ' (Nereid)। সৌরমণ্ডলে যত উপগ্রহ আছে তাদের মধ্যে নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের আকার হল সবচেয়ে বড়। ট্রাইটনের ব্যাস হল ৫,০০০ কিলোমিটারের মত। এর ভরও খুব বেশি। ফলে, ট্রাইটনকে ঘিরে একটা পাতল বায়ুমণ্ডল রয়ে গেছে। নিরিইদ উপগ্রহটির আকার খুবই ছোট, মাত্র ৩০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি হল এর ব্যাস।

নেপচুন গ্রহ আবিষ্কারের পরে, নেপচুনকে নিয়ে যে অঙ্কের হিসাবের কথাটা বলা হল, সেই সূত্র ধরেই লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইভ টমবাউ ১৯৩০ সালে প্লুটো গ্রহটি আবিষ্কার করেন। মঙ্গল গ্রহে খাল আবিষ্কার করে পার্সিভাল লোয়েল বিখ্যাত হয়েছিলেন। লোয়েল মানমন্দিরটি তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

প্লুটো গ্রহ সূর্য থেকে ৫৯১ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্লুটো গ্রহ ঠাণ্ডায় একদম জমাট বাধা। এটি সূর্য থেকে এত দূরে যে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৫০ বছর। আকারেও বেশি বড় নয়—মঙ্গল গ্রহের মত।

প্লুটো হল আমাদের সৌরমণ্ডলের শেষ গ্রহ। এর পর শুধু ফাঁকা, আর ফাঁকা জায়গা। এই ফাঁকা জায়গা শেষ হয়েছে গিয়ে অন্য নক্ষত্রের জগতে, তারার জগতে। সূর্যও একটি তারা বা নক্ষত্র প্রত্যেকটি তারাই আবার এক-একটি সূর্য—। সেইসব তারার দেশে আমাদের সূর্যের মত গ্রহ-উপগ্রহের সংসার নিয়ে আরো কতই তো তারা থাকতে পারে। আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহও থাকতে পারে। আমাদের মত মানুষও থাকতে পারে। সেসব কথা আমরা জানি না।

আমাদের পৃথিবীরপ্রতিবেশী যে সব গ্রহ উপগ্রহ তাদের বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কতটুকু বা জানতে পেরেছি ?

চতুর্থ পর্ব

সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদ

সূর্য ঃ পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা। সূর্যের সংসারে অন্যতম সদস্য হল আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলে অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। কারণ পৃথিবীর অবস্থার এমন একটি জায়গায় যে গরমে ঝলসেও যায় না আর ঠাণ্ডায় জমেও যায় না। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটা এমনই সঠিক বলে প্রাণের উদ্ভব এখানে হয়েছে। আর আমাদের পৃথিবীর যা কিছু—খাদ্য-বস্ত্র-শক্তি-শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, সবই আমাদের এই সূর্যের বয়স হয়েছে পাঁচশ কোটি বছর। আমাদের সূর্য তার সংসার নিয়ে যে গ্যালাকসিতে রয়েছে এমন গ্যালাকসি কোটি কোটি রয়েছে মহাবিশ্বে। আমাদের এই গ্যালাকসীতে সূর্য যত তারা রয়েছে দশ হাজার কোটি। এর চেয়েও বড় গ্যালকসি রয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের কাছের গ্যালাকসিটি অ্যানড্রোমিডা তারামণ্ডলের কাছে দেখা যায়। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে কুড়ি লক্ষ আলো-বছর। আর, চার আলো-বছরের কিছু বেশি দূরে অবস্থান হল সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারাটির।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল ১৪,৯৬,০০,০০০ কিলোমিটার। এই দূরত্বটা হল গড় দূরত্ব। শীতকালে এই দূরত্ব বেড়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে কমে যায়। আকাশের যতসব গ্রহ-নক্ষত্র আছে সবই আমরা দেখি পৃথিবীর মাটির ওপর থেকে। পৃথিবী তো নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে চলে বেড়াচ্ছে। তাই আমাদের আকাশ দেখাটা নির্ভর করে চলন্ত

পৃথিবীর নড়-চড়ার ওপর। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব এই যে বাড়ে-কমে—তারও কারণ পৃথিবীর চলাফেরা। তবে, আমরা পৃথিবীর মাটি থেকে এইসব চলাফেরা, ঘোরা, দোলা বা পাক খাওয়া কোনটাই বুঝতে পারি না।

যাই হোক, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা কিছু কম নয়। আমরা যদি ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন কোন বিমানে সূর্যের দিকে যাত্রা করে, আর পথে যেতে যেতে কোথাও এক মিনিটের তরেও না থামি তবে সূর্যে গিয়ে পেঁছাতে সময় লাগবে ৩,৮৭৪ দিন বা সাড়ে দশ বছরের চেয়েও কিছু বেশি। সূর্যের তুলনায় অন্যান্য নক্ষত্রগুলি অনেক অনেক দূরে। সবচেয়ে কাছের যেটি, তাতেও আমাদের ঘণ্টায় ১,৬০০ কিলোমিটার গতি বেগ সম্পন্ন বিমান গিয়ে পেঁছাতে সময় লাগবে ত্রিশ লক্ষ বছর। আর সেই কাছের নক্ষত্রটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পেঁছাতে সময় লাগে ৪·৩ বছর অর্থাৎ ৪·৩ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত সেই নক্ষত্রটি। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল ৮·২ আলোক মিনিট।

সূর্য বড় কতটা? পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় সূর্যের আয়তন ১৩,০০,০০০ গুণ। অর্থাৎ, তের লক্ষ পৃথিবীকে এক সঙ্গে করলে সূর্যের সমান হবে। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের ৩,৩৩,০০০ গুণ বেশি! এইসব মাপ বিশিষ্ট এক বিরাট গোলক হল সূর্য। সূর্যে কিন্তু কোন কঠিন বস্তু নেই—সবই গ্যাসে তৈরী। শুধু সূর্য নয় বিশ্বের সব নক্ষত্রই তৈরী গ্যাসে। আর এই গ্যাস একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা।

আমরা সূর্যকে বহুদূর থেকে দেখি। দেখে মনে হয় একটা সমান কিনারাওয়ালা গোলক। কিন্তু তা ঠিক নয়। সূর্যের গ্যাস পাতলা হতে হতে মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায়—পৃথিবীতে তার আলো এসে পেঁছায়। পৃথিবীতে সূর্যের আলো পেঁছায় বলেই আমরা সূর্যকে দেখতে পাই। আর, সূর্যের এই আলো যে জায়গা

থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার নাম হল—আলোকমণ্ডল। সূর্যের আলোকমণ্ডল হল কয়েক শ' কিলোমিটার পুরু একটা স্তর। এই আলোকমণ্ডলকেই আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই, আর দেখতে পাই গোলাকৃতি হিসাবে। আলোকমণ্ডল হল সূর্যের উপরিতল। আলোকমণ্ডলের ওপরের দিককে বলা হয় ছটামণ্ডল। এই ছটামণ্ডল ছড়িয়ে গেছে মহাশূন্যের লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত—সে হিসাব কেউ জানে না। এই দুটো মণ্ডলের মাঝখানে রয়েছে বর্ণমণ্ডল। ছটামণ্ডল ও বর্ণমণ্ডলের আলো কম, আলোকমণ্ডলের আলো বেশি। তাই আমরা পৃথিবী থেকে আলোকমণ্ডলকেই দেখতে পাই। পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণ হলে সূর্যের আলোকমণ্ডলটি চাঁদের আড়ালে চলে যায়। ঠিক সে সময়েই আমরা সূর্যের ছটামণ্ডল আর বর্ণমণ্ডল দেখতে পাই।

সূর্য পৃথিবীতে যে তাপ পাঠিয়ে থাকে তার সবটাই আসে আলোকমণ্ডল থেকে। আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা হল ৬০০০° সেণ্টিগ্রেড। সূর্যের কেন্দ্রীয় মণ্ডলের তাপমাত্রা এক অভাবনীয় ব্যাপার। কেন্দ্রীয় মণ্ডলের তাপমাত্রা হল ১,৫০,০০,০০০° সেণ্টিগ্রেড। কিন্তু বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডলের তাপমাত্রা খুবই কম। কেন্দ্রীয় মণ্ডলের এই যে অভাবনীয় তাপমাত্রা তা আমরা জানতে পেরেছি বর্ণালিবীক্ষণ থেকে। শুধুমাত্র তাপমাত্রাই নয়—সূর্যের বিষয়ে অনেক কিছুই আমরা এথেকে জেনেছি।

প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো বেরিয়ে এলে তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গিয়ে রামধনুর চেহারা নেয়। এতে আছে সাতটি রঙ। এইভাবে প্রিজমের সাহায্যে কাজ শুরু করেছিলেন নিউটন। পরে জার্মান বিজ্ঞানী জে ফ্রাউনহোফার সূর্যের আলো নিয়ে বর্ণালিবীক্ষণ শুরু করেন। এ হল উনিশ শতকের কথা। বর্ণালিবীক্ষণে কেবল সাতটি রঙই দেখা গেল না—দেখা গেল এইসব রঙের ওপরে রয়েছে কালো কালো সব দাগ। দাগগুলি

আবার সব একরম নয়, সব সময়েই একই আকারেরও থাকে না। আবার কতকগুলির একই জায়গায় একইভাবে থেকে যায়। কোন কোনটি আবার খুবই তীব্র। বর্ণালির হলুদ রঙের অংশে পাশাপাশি আবার দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানীরা এই রকম পাঁচশ দাগের সন্ধান আবিষ্কার করলেন বর্ণালিবীক্ষণ থেকে।

সূর্যের এইসব কালো দাগ ও বর্ণালিবীক্ষণ থেকে সূর্যে ৭০টিরও বেশি মৌলিক পদার্থের সম্বল পাওয়া গেছে। যদিও পৃথিবীতে পাওয়া গেছে ৯২টি মৌলিক পদার্থ। সূর্যে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম, হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন আছে। হিলিয়াম হল হাইড্রোজেনের চেয়েও হাল্কা। আর সূর্যের এই যে প্রচণ্ড জ্বলন্ত অবস্থা তার মূলে রয়েছে হাইড্রোজেন 'জ্বালানি' প্রচণ্ড-ভাবে জ্বলে চলেছে।

যে প্রক্রিয়ায় সূর্য জ্বলছে তা হল নিউক্লিয়র ফিউসন প্রক্রিয়া বা পারমাণবিক একীভবন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয়। শুধু সূর্য নয়, মহাকাশের বিপুল সংখ্যক জ্বলন্ত তারার কারণ—এই একটিই। আর, এই পারমাণবিক জ্বালানি হিসাবে সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে প্রয়োজন হচ্ছে লক্ষ-লক্ষ টন হাইড্রোজেন। এইভাবে হাইড্রোজেন পুড়তে পুড়তে সূযের হাইড্রোজেন-ভাণ্ডার শেষ হবে একদিন। সেদিন সূর্য যাবে নিভে।

পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের বাইরের দিকটাই দেখতে পাই। এই অংশের নাম হল আলোকমণ্ডল। সূর্যের এই উপরিতলের কালো কালো ছোপ-ছোপ দাগগুলির তাপমাত্রা ৪,০০০° সেণ্টিগ্রেড। বেশি উত্তপ্ত এলাকার পাশে কম উত্তপ্ত এলাকা থাকলে বহুদূর থেকে তাকে কালো দেখায়। এই দাগগুলো সব সময় একই জায়গায় থাকে না, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। এ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, পৃথিবী যেমন

তার অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে—সূর্যও তেমনি তার অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে। সূর্য পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পাক খাচ্ছে। পৃথিবীর পাক-খাওয়াটা হল কঠিন বস্তুর, আর সূর্যের পাক- খাওয়াটা হল জ্বলন্ত এক গ্যাসীয় গোলকের।

সূর্যের কালো কালো দাগগুলি শুধু মাত্র আকারে বা সংখ্যায় বাড়ে-কমে তাই না--মাঝে মাঝে থাকেও না। এই দাগ থাকা এবং না থাকা অবস্থায় ঘটে থাকে এগারো বছরের একটি চক্রে। কালো দাগ না থাকা অবস্থায় সূর্যকে বলা হয় শান্ত-সূর্য। এই দাগগুলি হচ্ছে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক-ক্ষেত্র। সূর্যে কালো দাগ তৈরি হওয়ার সময় কালো দাগের কাছাকাছি এলাকায় চলতে থাকে প্রচণ্ড উদ্গীরণ। আর, এই উদ্গীরণের এলাকা থেকে সেই সময় চলতে থাকে তড়িতাবিষ্ট কণিকার প্রবাহ এবং অতি বেগুনী রশ্মির বিকিরণ। আট মিনিটের মধ্যেই এইসব বিকিরণ ও প্রবাহ পৃথিবীতে এসে পেঁছে যায়। অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর আয়ন মণ্ডলকে তখন বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে পৃথিবীতে রেডিও-যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেখা দেয় বিপর্যয়। তড়িতাবিষ্ট কণিকার প্রবাহের জন্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রেও আসে বিপর্যয়, কম্পনের কাঁটা ঠিকমত কাজ করে না।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র মেরু এলাকায় এই সময় মেরু-জ্যোতি দেখা যায়।

অমাবস্যার দিনে সূর্যগ্রহণ হয়। এই গ্রহণ কখনো হয় আংশিক, কখনো বলয়, আবার কখনো পূর্ণগ্রাস। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় আলোকমণ্ডল চাঁদের আড়ালে চলে যায়। আর তখন আলোকমণ্ডলকে মনে হয় যেন কালো একটা চাকতি। আর আর এই চাকতিকে ঘিরে দেখা যায় বর্ণমণ্ডল—রঙ তার লাল। বর্ণমণ্ডল কয়েক হাজার কিলোমিটার। বর্ণমণ্ডলের পর লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায় ছটামণ্ডল। বর্ণমণ্ডল থেকে

জ্বলন্ত গ্যাসের লক্‌লকে ছটা শিখা দেখা যায়। ছটামণ্ডলের আলো ম্লান। তার পাশেই বর্ণমণ্ডলের জ্বলন্ত গ্যাসের লক্‌লকে শিখা। এই শিখার নাম দেওয়া হয়েছে সমুত্থান। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় ক্যামেরায় ছবি তুলে তা চলচ্চিত্রে দেখান হয়েছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তখন সূর্য আর চক্‌চকে চাকতি নয়। নড়াচড়া করছে, শিখাগুলি কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্যের আলোকমন্ডলের প্রচণ্ড উজ্জ্বলতার জন্যে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় আলোকমণ্ডল চাঁদের আড়ালে চলে গেলে। তবে সূর্যের এই যে কেন্দ্রীয় অঞ্চল, প্রচ্ছায়া আর উপচ্ছায়া—এসব খালিচোখে দেখা যায় না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ও সূর্যকে খালি চোখে দেখতে নেই। দেখলে চিরদিনের মত অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।

পৃথিবী যেমন ছুটছে, সূর্যও তেমনি ছুটে চলেছে মহাশূন্যে স্থির হয়ে নেই। সূর্য ছুটে চলেছে সেকেণ্ডে কুড়ি কিলোমিটার বেগে। পৃথিবী সূর্যের টানে বাঁধা পড়া অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে ছুটে চলেছে। পৃথিবী সূর্যের টানে বাঁধা পড়া অবস্থায় সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলে। সূর্যের অবস্থান যে গ্যালাক্‌সিতে তার কেন্দ্রের চারদিকে একবার পাক খেয়ে আসতে সূর্যের সময় লাগে কুড়িকোটি বছর। সূর্যের বয়স এখন ৫০০ কোটি বছর। আমাদের গ্যালাকসির বিস্তার যতটা সেই হিসাবে সূর্য তার জন্মাবার পর থেকে পাক খেয়েছে বার পঁচিশ!

মহাকাশে এসব এক বিচিত্র ব্যাপার—সবই ঘুরছে, পাক খাচ্ছে আর ছুটে চলেছে। সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, তারা, গ্যালাকসি—সব, সব কিছুর এক প্রচণ্ড গতিবেগ আর পরস্পরের মধ্যে টানাটানি। আর আমরা কিনা এসব জানতে পারলেও পৃথিবীতে বসে বুঝতে পারি না। এইভাবে সূর্য ছুটতে-ছুটতে পাক খেতে-খেতে আর

জ্বলতে-জ্বলতে একদিন যাবে নিভে। তবে সেদিন বহু দূরে, পৃথিবীর হিসাবে হাজার-কোটি বছর তো বটেই। আমরা মানুষেরা ততদিন পৃথিবীতে থাকব! যদি না পারমাণবিক যুদ্ধের কল্যাণে নিজেদের নিজেরা ধ্বংস করে না দিই।

পৃথিবী ঃ পৃথিবীর আকার বিষয়ে আগে আমাদের ধারণা ছিল ভুল। আমরা জানতাম পৃথিবী নামক গোলকটি দুই মেরু দেশে একটু চাপা, আর বিষুব-এলাকায় একটু ফোলা। অনেকটা আপেলের আকার। আমাদের এই ধারণাটি ছিল ভুল। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এখন পৃথিবীর সঠিক আকারটি জানা গেছে। আর জানা গেছে পৃথিবীকে পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখে। পৃথিবীর দুই মেরু-দেশ চাপা—তা ঠিক। তবে সমান-সমান নয়। একদিক বেশি, অন্যদিক কম। উত্তর মেরুর দিকটা কম-চাপা, দক্ষিণ মেরুর দিকটা বেশি-চাপা। আকারটি আপেলের মত নয়—বলা চলে নাশপাতির মত।

বিষুব গোলকের দিকে পৃথিবীর ব্যাস হল ১২,০৫৭ কিলোমিটার, পরিধি হল ৪০,০৭৫ কিলোমিটার। মেরুর দিকে পৃথিবীর ব্যাস হল ১২,৭১৪ কিলোমিটার এবং পরিধি হল ৪০,০০৮ কিলোমিটার।

এই নাসপাতির মত আকার বিশিষ্ট পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-মহাসমুদ্র নিয়ে কেমন উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো, খানা-খন্দ, গর্ত—এইসব।

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। সৌরমণ্ডলে অন্য কোন গ্রহে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল নেই। এই বায়ুমণ্ডলের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। আর, এই বায়ুমণ্ডলের জন্যেই আমরা আকাশকে দেখি নীল, মেরু-জ্যোতি দেখতে পাই, তারা-খসা দেখতে পাই। বায়ু-

মণ্ডলের জন্যে সকালে আর সন্ধ্যার আকাশে কতো না রঙের খেলা দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে আমরা আকাশকে দেখি নীল। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলেই আকাশ আর নীল রঙের নয়, তখন দেখায় কালো। আর সেই কালো আকাশে ঝকঝকে সব গ্রহ-নক্ষত্র। রঙের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কী হয়—রঙ সব যায় কোথায়! এসব মানুষের চোখে দেখা। সোভিয়েত, মার্কিন সব মহাকাশচারীরা এসব নিজের চোখে দেখেছেন। দেখেছেন আর বলেছেন—সঙ্গে সঙ্গে সেসব বার্তা বেতারে পৃথিবীতে এসে পেঁছেছে। এমনকি—সূর্যের যেসব মণ্ডল বা জ্যোতির্বলয়ের আমরা জানি বা দেখি, সে সবকিছুই পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখা যায় না। সূর্যকে মনে হয় একটা জ্বলন্ত চক্র—সেটি যেন গাঁথা রয়েছে এক কালো কুচকুচে ভেলভেটে। সোভিয়েত নভশ্চর লিওনভ ব্যোমযানের বাইরে এসে মহাকাশ থেকে এসব কথা বলেছেন।

তবে আমরা যে আকাশকে পৃথিবী থেকে নীল দেখি। কেনই বা এমনটি দেখি? সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত ভেসে আসছে আলোর ঢেউ, এসব ঢেউ নানা রঙের। কোনটি আকারে বড়, আবার কোনটি আকারে ছোট। এসব ঢেউ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আছড়ে পড়ে, আঘাত খায়। নীল রঙের ঢেউ ছোট-ঢেউ—ভেঙে যায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ে আঘাত খেয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সারা আকাশে ছড়িয়ে যায়। সূর্য থেকে অনবরত আসা এই নীল আলোর ঢেউ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চলেছে তো চলেইছে—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঝরে পড়ছে তো পড়ছেই। এই জন্যেই আমরা আকাশকে দেখি নীল। নীল রঙের ঢেউ-এর জন্যে সূর্যকে দেখি লাল। এসব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্য। পৃথিবীর

বায়ু কণার সঙ্গে যদি সূর্যের আলোর ঢেউ-এর কোন ধাক্কা-খাওয়া বা বাধা-পাওয়া না থাকত তবে আমরা কোন রঙ দেখতে পেতাম না। তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের নীল রঙের প্রায় সবটাই ছেঁকে বের করে নেয়। পৃথিবী থেকে সূর্যকে লাল দেখায় বায়ুমণ্ডলের জন্যে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এসব কিছুই থাকে না।

পৃথিবীকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকটা ঘন আর যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই পাতলা। বায়ুমণ্ডল যত ঘন হবে, তার চাপও হবে বেশি। মাটির কাছাকাছি বায়ুর চাপের চেয়ে ওপরের দিকের চাপ কম বলে আমরা ওপরের দিকে উঠলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাদের শরীরের ওপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়ছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনেরো পাউণ্ডের মত।

পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম স্তরের নাম হল ট্রোপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধমণ্ডল। এই স্তর পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি। এখানেই চলে ঝড় ঝাপটা-বাদল। এর ওপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ারের। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের পরে আশি কিলোমিটার থেকে কয়েকশ' কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আয়নোস্ফিয়ার। আয়নোস্ফিয়ারের পরের বায়ুমণ্ডল খুবই হাল্কা। এর শেষ কোথায় তাও জানা যায়নি। এই স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে এক্সোস্ফিয়ার।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল স্ট্রাটো-স্ফিয়ার। এই স্তরে ওজোন নামে একটি পাতলা স্তর আছে। ওজোন হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের হাল্কা অক্সিজেন গ্যাস। এই গ্যাসের স্তরের একটি বিশেষ গুণ আছে। সূর্য থেকে আসে প্রাণঘাতী অতি বেগুনী রশ্মির ঢেউ। অতি বেগুনী রশ্মির পক্ষে এই ওজোন স্তর হল দুর্ভেদ্য। ওজোন গ্যাসের পর্দা ভেদ করে সূর্যের

অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে আসতে পারে না। আর —আসতে পারে না বলেই পৃথিবীতে আমরা আছি, প্রাণীজগৎ আছে।

বায়ুমন্ডল আছে বলেই সূর্য কিরণ সোজাসুজি পৃথিবীতে ঢুকে আসতে পারে না। আবার রাত্রে খুব ঠাণ্ডাও হয়ে যায় না। এ হোল একটা আবরণ—যা আমাদের অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে দিনের বেলায় প্রচণ্ড উত্তাপ—সহ্যের একেবারে বাইরে, আর রাত্রের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক কম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীর দশা চাঁদের মতই হ'ত।

ছয় সংখ্যাটির পরে একুশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তত টন হ'ল পৃথিবীর ওজন। জলের ঘনত্বকে এক ধরলে পৃথিবীর ঘনত্ব হ'ল প্রায় সাড়ে পাঁচ।

কিন্তু, পৃথিবীর মত এই বিরাট এক বস্তুপিণ্ডের ওজন নেওয়াটা তো কম কথা নয়। তবে, এই সমস্যার সমাধান হয়েছে বিজ্ঞানী নিউটনের কল্যাণে, তাঁর মহাকর্ষের সূত্রের সাহায্যে।

মহাবিশ্বের প্রতি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে, প্রতিটি কণিকা প্রতিটি কণিকাকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী যেমন আমাদের আকর্ষণ করছে আমরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করছি। তবে এই আকর্ষণ বা টানা-টানির কম-বেশিটা নির্ভর করে বস্তু মিলিত ভরের ওপরে। পৃথিবী আপেলকে টানল, আপেলও পৃথিবীকে টানছে, কিন্তু, আপেল পড়ল মাটিতে। পৃথিবী প্রকাণ্ড বস্তু, আপেল ছোট বস্তু। তাই আপেলের টান অতি নগণ্য। পৃথিবীর টান খুব বেশি বলে আপেল মাটির বুকে এসে পড়ল। এবার ওজন করলে দেখা যাবে, আপেলেরও ওজন আছে বা ভর আছে। ভর আছে বলেই টান আছে। টান কতটা তা ওজন থেকে জানা যায়। পৃথিবীর টানের জন্যে আপেল মাটিতে পড়ল। এবার যদি পড়ন্ত আপেলের পাশে কোন একটি

প্রকাণ্ড বস্তু থাকে, তবে আপেল সোজাসুজি মাটিতে না পড়ে সেই প্রকাণ্ড বস্তুটার দিকে একটু সরে গিয়ে মাটিতে পড়বে।

এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ওজন ১৭৪০ সালে এক ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম পৃথিবীর ওজন নিয়েছিলেন। কী করে তা সম্ভব? আমরা যদি একটা বড় পর্বতের ওপর থেকে একটা পেন্ডুলাম ঝুলিয়ে দিই, তবে সেই পেণ্ডুলামটি ওপর থেকে সোজাসুজি মাটির ওপরে ঝুলবে না। ফেলে দিলেও সোজাসুজি মাটিতে পড়বে না। একটু সরে যাবে পর্বতের দিকে। কারণ পর্বত পেণ্ডুলামটিকে টানছে। আর কতটা সরে গেল পর্বতের দিকে সেই মাপ নিয়ে পর্বতের ভর হিসাব করে ঠিক বলে দেওয়া যায়। পর্বতের ভর জানতে পারলে পৃথিবীর ভরও সহজেই হিসাবে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতেই প্রতিবার নানা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীর ওজন নেওয়া হয়েছে। প্রতিবারেই সেই একই প্রকার ওজন পাওয়া গেছে। চাঁদ পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে বাঁধা পড়ে আছে। চাঁদের দূরত্ব জানা থাকলে তা থেকে পৃথিবীর ওজন হিসাব করা যায়, আবার চাঁদের ওজনও হিসাব করে বলে দেওয়া যায়। সূর্যের ভর পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩·৩ লক্ষ গুণ বেশি। সূর্য পৃথিবীকে টানছে। কতটা জোরে টানছে—এই সূত্র ধরেই আমরা সূর্যের ভর জানতে পেরেছি।

পৃথিবীর বয়স হল প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। ভূত্বকের তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিশ্লেষণ করে এই হিসাব নির্ভুল ভাবে করা হয়ে থাকে। মোটামুটি এই হল আমাদের পৃথিবী। আর পৃথিবীর উপগ্রহ হল চন্দ্র।

চন্দ্র ঃ পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র বা চাঁদকে কত না সুন্দর দেখায় পৃথিবী থেকে। পূর্ণিমার রাতে পৃথিবী আলো-করা জ্যোৎস্নায় চোখ ভরে যায়, মন ভরে যায়। তাই চাঁদকে নিয়ে কত না গল্প কত

না কাহিনী আর কাব্য। কিন্তু চোখে দূরবীণ লাগিয়ে যদি দেখি সেই চাঁদকে, তখন সুন্দর আর সুন্দর থাকে না। দেখতে পাওয়া যায় সারি-সারি ন্যাড়া-ন্যাড়া খাড়া-খাড়া সব পাহাড়-পর্বত। আর, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে গর্ত আর গর্ত, এদিক সেদিক সব ছড়ান। একে কে বলবে সুন্দর? মোটেই না। পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যে স্নিগ্ধতা, তা নেই।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকে ঘুরে চলেছে। তাই, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কখনো কমে, আবার কখনো যায় বেড়ে, চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে থাকে—সে দূরত্ব হল—তিন লক্ষ একশট্টি হাজার ছয়শ' কিলোমিটার। আর, সবচেয়ে দূরে যখন থাকে—সে দূরত্ব হল, চার লক্ষ তিন হাজার দুশ' কিলোমিটার। গড় দূরত্ব হল চার লক্ষ কিলোমিটারের মত।

চাঁদের ব্যাস হল ৩,৪৫৬ কিলোমিটার। পঞ্চাশটা চাঁদকে একসঙ্গে করলে আকারে পৃথিবীর সমান হবে।

চাঁদের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। আর, ভর হল পৃথিবীর একাশি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ, একাশিটা চাঁদকে একত্র করলে পৃথিবীর ভরের সমান হবে।

চাঁদের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে বলেই আমরা চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। আর এই দেখাটা হয় প্রতিমাসে নিয়মিত বাড়া-কমায়। পূর্ণিমায় আমরা গোটা চাঁদকে দেখতে পাই। অমাবস্যায় থাকে অন্ধকার।

সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে যখন চাঁদ থাকে। তখন চাঁদের যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সেই অংশ থাকে পৃথিবীর উল্টো দিকে। তাই এই অন্ধকার অংশ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না বলেই অমাবস্যা। এরপর চাঁদ প্রতিদিন ৫0 মিনিট পরে পরে উদয় হয়। অর্থাৎ ঘুরতে ঘুরতে সরতে থাকে। তখন আমরা একটু একটু

করে বেশি বেশি অংশ দেখতে পাই। এ হল চাঁদের কলা। এইভাবে ফালি চাঁদ থেকে পূর্ণিমায় পুরো চাঁদের গোল চাকতি দেখতে পাই। তখন পৃথিবী থাকে সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে। আবার পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদ কমতে কমতে চলে আসে আগের অবস্থায়, অমাবস্যায় —পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে।

অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়া, তৃতীয়ায় ফালি চাঁদ আকাশে দেখা দিয়ে দিনে দিনে বড় হতে শুরু করায় দিনগুলি হল শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদ ছোট হতে শুরু করায় পক্ষ হল কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী বা ত্রয়োদশীর দিন সূর্য ওঠার একটু আগে শেষ চাঁদ দেখা যায় পূব আকাশে—তারপরেই অমাবস্যা। পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে চাঁদের গতি থাকার দরুনই এমনটি হয়ে থাকে। আর, পৃথিবী থেকে চাঁদের একটা পিঠ আমরা কখনো দেখতে পাই না।

পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ তো ঘুরে চলেছে। তবে, এই চাঁদের ঘুরে চলাটা একটু মজার। পৃথিবী টানছে চাঁদকে, আবার চাঁদও টানছে পৃথিবীকে। চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। আবার ঘুরন্ত চাঁদকে নিয়ে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২৭⅓ দিন। কিন্তু পৃথিবীও নিজের কক্ষপথে ঘুরে চলায় হিসাবমত সময় একটু বেশি লাগে। এক অমাবস্যা থেকে অন্য অমাবস্যা হল চান্দ্রমাস। এই চান্দ্রমাসে সময় হল ২৯½ দিনে। এই চান্দ্রমাসে চাঁদে প্রায় পনেরো দিন ধরে এক-দিকে দিনের আলো আর অন্য দিকে অন্ধকার।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে—চাঁদকে নিয়েই পৃথিবী ঘুরছে আরকি। আর, এ টানছে ওকে, ও-টানছে তাকে। টানা-টানিতে সব বন্দী। পৃথিবীর কাছে চাঁদ। তাই চাঁদের টান বেশি পৃথিবীতে। সূর্য দূরে—সূর্যের টান কম। পৃথিবীর সমুদ্রের জলের ওপর চাঁদ ও সূর্যের

টানের জন্যেই জোয়ার ভাটা হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার করে। এটা হয়ে থাকে, পৃথিবী আর চাঁদের পাক খাওয়ার জন্যে আর, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় একই রেখায় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য থাকায় টান বেশি হয়। তাই জোয়ার হয় প্রবল।

চাঁদের দেশ ঃ প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ—চাঁদের বুকে কালো কালো ছোপ দেখে সাগর বলে ভেবে তার নামকরণ করেছিলেন। পরে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখা গেল এগুলো সাগর নয়, চাঁদে জল নেই। নামগুলি বেশ সুন্দর—স্নিগ্ধ সাগর, শান্ত সাগর, বর্ষণ সাগর! এ নামগুলি কিন্তু এখনও আছে। এগুলি সব বিশাল-বিশাল সমতলভূমি। প্রশ্ন—কী করে হল ? লাভাজাতীয় পদার্থ কোনকালে চাঁদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এই সমতল-ভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই ব্যোমযান অবতরণ করেছিল ধীরে ধীরে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের এই শান্ত সাগর এলাকায় পায়ে হেঁটে মানুষের পায়ের ছাপ রেখে এসেছে।

যতটাই সমতল-ভূমি বলা হ'ক না কেন—চাঁদের এই এলাকার ততটা সমতল নয়, মসৃণ নয়। এখানটা খুব উঁচু-নিচু, ছোট-বড় সব ঢিবি, জ্যালামুখের গর্ত, বড়-বড় আঁকা-বাঁকা ফাটল—এইসব। কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখে যে ধারণা করা হত প্রচুর ধুলোর বিষয়ে—তা কিন্তু নেই। চাঁদের মাটি বেশ শক্ত।

আর, পৃথিবী থেকে যে অংশটা আমরা দেখি ছায়া-ছায়া—কলঙ্ক যার নাম,সেখানে আছে বড়-বড় ছোট-ছোট হাজার হাজার গহ্বর। মাটি খুবই অসমতল। কোথাও বা বিশাল পাহাড়-পর্বত, তারই পাশে বিরাট এলাকা জুড়ে জ্বালামুখ। জ্বালামুখের চারদিকে লাভা জমে জমে উঁচু দেওয়াল। চাঁদের পাহাড়-পর্বত মোটেই ছোট নয়—সবচেয়ে উঁচু যেটি তার উচ্চতা হল ৭,৯০০ মিটার। আর সবচেয়ে বড় গহ্বর যেটি, তার ব্যাস হল ২৫০ কিলোমিটায়েরও বেশি। আর এর চারদিকে আছে, দেওয়াল।

পৃথিবী থেকে চাঁদের এই গহ্বরগুলির নাম দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামে। যেমন—টলেমি, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা বলেন, এইসব গহবর তৈরী হয়েছে দুটি কারণে। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ায় এসব জ্বালামুখ হতে পারে। আবার চাঁদের প্রচুর পরিমাণে উল্কাপিণ্ড এসে আছড়ে আছড়ে পড়ে। এজন্যও এইসব গহ্বর হতে পারে। মহাকাশ গবেষণায় রত বিজ্ঞানীগণ চাঁদের শিলা চাঁদের ত্বক এসব নিয়ে এখন গবেষণায় ব্যস্ত।

আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদ দেখি—পৃথিবীর আকাশে দেখি। তেমনি চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীকেও দেখা যায়। তবে—এই দুই প্রকার দেখাটি মোটেই এক রকম নয়। পৃথিবীর আকাশ দিনের বেলায় নীল, রাতের বেলায় আঁধারে আকাশে ফুটে থাকে চাঁদ-তারা। আর—চাঁদের আকাশ? দিনের বেলাতেও কালো কুচকুচে, রাতে তো বটেই। এই কালো কুচকুচে আকাশে দিনে-রাতে সব সময়েই তারারা ফুটে থাকে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলেই এমন অবস্থা।

আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের একটা পিঠ দেখতে পাই। অন্য পিঠটা থাকে উল্টো দিকে। কিন্তু, চাঁদ থেকে পৃথিবীর না আছে উদয়, না আছে অস্ত। মোটামুটি একই জায়গাতেই যেন পৃথিবী রয়েছে। একই জায়গা থেকেই পৃথিবী নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়। চাঁদ যতটা সময়ে পৃথিবীকে একবার ঘুরছেঠিক ততটা সময়েই একবার পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ কক্ষ আবর্তনে যতটা সময় লাগছে, অক্ষ আবর্তনেও ঠিক ততটা সময় লাগছে। এইজন্যে চাঁদের একটা দিক সব সময়েই পৃথিবীর আড়ালে থেকে যায়। এদিকটা হল পৃথিবী থেকে চাঁদের উল্টো দিক। এখান থেকে পৃথিবীকে কোনদিনই একেবারেই দেখা যায় না। আর, পৃথিবী মুখো দিক থেকে সবসময়ই আকাশের একই জায়গায় পৃথিবীকে দেখা যায়।

তাহলে, চাঁদের এই পৃথিবী-মুখো পিঠ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায়? দেখায় একটা মস্ত থালার মত। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যতটা বড় দেখায়, চাঁদকে দেখায় তার চেয়ে চোদ্দগুণ বড়। আর পৃথিবী থেকে ঠিকরে পড়া আলো—সে হল চাঁদের তুলনায় নব্বই-গুণ বেশি।

চাঁদের বায়ুমণ্ডল নেই, বাতাস নেই। এর কারণ হল মহাকর্ষের নিয়ম। চাঁদ আকারে পৃথিবীর চেয়ে ছোট তাই টান কম। পৃথিবীর টান চাঁদের চেয়ে ছয়গুণ বেশি। এইজন্যে চাঁদ বাতাসকে তার নিজের বুকে ধরে রাখতে পারেনি। কোথায় কবে যে সে-বাতাস মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। আর, এই টানের পৃথিবীর বাতাস পৃথিবীর গায়ে জড়িয়ে আছে।

এই মহাকর্ষের নিয়মটা একটু দেখা যাক। মহাকর্ষের বিষয়টা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী নিউটন। পৃথিবীর বেলায় এই মহাকর্ষকে আমরা বলি—অভিকর্ষ। সেই আপেলের গল্প—সেখান থেকেই নিউটনের ভাবনার শুরু।

এই ভাবনা হল—সবাই সবাইকে টানছে। বড় ছোটকে টানছে, ছোট বড়কে টানছে! এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু সবাই সবাইকে টানছে। পৃথিবী যেমন আমাদের টানছে, আমরাও প্রত্যেকে পৃথিবীকে টানছি। পৃথিবীর তুলনায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাই আমাদের টানটা পৃথিবীর কাছে কিছুই না। কিন্তু পৃথিবীর টানে আমরা পৃথিবীতে আটকে গেছি। ঠিক তেমনি সূর্য পৃথিবীকে টানছে। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড়। তাই পৃথিবী সূর্যের টানে চিরতরে বাঁধা পড়ে আছে। সূর্যের টান যদি না থাকত তবে আমাদের পৃথিবী মহাকাশের কোথায় যে ছিটকে চলে যেত কেউ জানে না। ঠিক তেমনি চাঁদের বেলাতেও। পৃথিবীর টানে চাঁদ বাঁধা পড়েছে। আবার—এই টানের সঙ্গে রয়েছে ছুট। ছুটের জন্যে পৃথিবী, চাঁদ ঘুরে চলেছে—টানও

একই সঙ্গে কাজ করছে। শুধু টান নয় বা শুধু ছুট নয়। শুধু টান থাকলে চাঁদ এসে দুম করে পৃথিবীতে ধাক্কা মারত, আর পৃথিবী চলে যেত সূর্যের ভিতরে। টান এবং ছুট দু'টোই এক-সঙ্গে কাজ করছে।

কোন বস্তুর টান কতটা হবে তা নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের ওপরে। বিষয়টি হল—বস্তু দুটির দূরত্ব এবং বস্তুর তাদের ভর। দূরত্ব যদি কমে এবং ভর যদি বাড়ে তবে টান বারবে। ঠিক তেমনি ভর যদি কমে এবং দূরত্ব বাড়ে তবে টান কমে। মহাকর্ষের টানটা অন্যান্য টানের মত নয়—এহল এক অদ্ভুত ধরনের টান। এই টানকে আটকে রাখা যায় না। এই টানের বাইরে যাওয়াও ছিল খুব কঠিন। এই টানের বাইয়ে যেতে হলে প্রয়োজন প্রচণ্ড ধাক্কা বা ছুট দিয়ে কোন বস্তুকে বাইরে পাঠান। যে ভাবে মহাকাশযান পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এবিষয়টি পরে আমরা আলোচনা করব।

এবার পৃথিবী আর চাঁদের টান এবং ছুট ব্যাপারটা দেখা যাক। পৃথিবী বড়, চাঁদ ছোট। পৃথিবী চাঁদকে টানছে, চাঁদও পৃথিবীকে টানছে। চাঁদ ছোট বলে চাঁদের টান কম পৃথিবী বড় বলে পৃথিবীর টানটা বেশি। পৃথিবীর টান চাঁদের চেয়ে ছয়গুণ বেশি। ব্যাপারটা কী হল—তুমি যদি পৃথিবীতে হাই-জাম্প দিতে পার ছয়ফুট, তবে চাঁদের মাটিতে দিতে পারবে ছয় গুণ ছয়—ছত্রিশ ফুট। কী সব ব্যাপার—না!

আবার এমনি ধর—তোমার উড়ন-তুবড়ী, পৃথিবীতে ওপরের দিকে উঠল একশ' ফুট—তবে, চাঁদে তা উঠবে ছয়শ' ফুট—এবার এই উড়ন-তুবড়ীকে অনেক অনেক বড় করা গেল এবং অনেক অনেক উঁচুতে তা উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে তা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মহাকাশে মিলিয়ে গেল। হতে পারে কি? পারে—হয়েছে, রকেট। তাহলে এই উড়ন-তুবড়িকে কেমনভাবে তৈরী

করতে হবে ? আগুন দেওয়ার পর তুবড়ি যখন আকাশের দিকে ছুটল, তখন তার গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার হয় তাহলে উড়ন-তুবড়ির এই ছুট পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে মহাকাশে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর টানকে কাটাতে গেলে সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন ছুট প্রয়োজন। আর চাঁদের বেলার কম—ছয় ভাগের এক ভাগ হলেই চলবে। প্রতি সেকেন্ডে ২.৫ কিলোমিটার বেগ সম্পন্ন ছুট হলেই চাঁদের টান কাটিয়ে ওঠা যায়। চাঁদের এই টান কম বলেই চাঁদের বাতাস চাঁদের বুক থেকে চলে গেছে—মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। পৃথিবীর টান বেশি বলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে।

চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার আর একটা কারণ আছে। পৃথিবীর বাতাসে আছে ধুলো, বাষ্পের কণা আর নানাপ্রকার মৌলিক পদার্থের কণা। এই কণাগুলি দিনরাত পৃথিবীর বুকে ছুটো-ছুটি করে বেড়ায়। এর গায়েও ধাক্কা দেয়, গুঁতোগুঁতি করে। দিনের বেলায় রোদে বাতাস গরম হয়, তখন এই কণাগুলির ছুটো-ছুটি গুঁতোগুতি বাড়ে। কিন্তু এমন ভাবে সেই ছুটোছুটি বাড়ে না যে প্রতি সেকেণ্ড এগারো কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন হয়। কী করে হবে ? পৃথিবীর টান যে বেশি। পৃথিবী ওদের ধরে রাখে—বেরিয়ে যেতে দেয় না।

অন্য দিকে—চাঁদের পিঠে দিন-রাত পৃথিবীর মত নয়। চাঁদের এক পিঠে একটানা প্রায় পনেরো হল দিন আর অন্য পিঠে তখন চলে একটানা পনেরো দিন ধরে রাত। যে পিঠে এই পনেরো দিন টানা সূর্যের মুখোমুখি যেখানে প্রচণ্ড উত্তাপ—ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি। এত বেশি উত্তাপে বাষ্পের কণাও হয়ে উঠবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত। উত্তপ্ত হয়ে লাগাবে ছুটো-ছুটি, ঠেলা-ঠেলি গুঁতো-গুঁতি। এই ছুটো-ছুটির গতিবেগ সেকেণ্ডে আড়াই কিলোমিটার পৌঁছে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। কারণ হল এই

প্রচণ্ড উত্তাপ। আর, চাঁদের টান কম সে ধরে রাখতে পারবে না বাষ্পের কণাকে। তাই, বাষ্পের কণা অতি সহজেই চাঁদকে ছেড়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।

চাঁদের যে পিঠে টানা পনের দিন ধরে রাত চলে সেখানে আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সে ঠান্ডা বরফের চেয়েও বেশি—শূন্যের নীচে ১৬০° সেণ্টিগ্রেড। আবার দেখা গেছে চাঁদের ওপরটায় এত গরম আর এত ঠাণ্ডায় তাপমাত্রা ওঠা-নামা করছে। তবে এই গরম-ঠাণ্ডায় চাঁদের মাটির ওপরেই—ভিতরে তা পেঁছিতে পারে না, পৃথিবীর তাপমাত্রা তার বায়ুমণ্ডলের জন্যে এরকম ওঠা-নামা করে না। দিনে যা তাপ থাকে রাতে তার বিশেষ হেরফের হয় না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দিনের তাপমাত্রাকে ধরে রাখে।

চাঁদের পিঠে আর এক বিপদ—মহাজাগতিক-রশ্মি আর উল্কাপাত। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে ওজন-স্তর আছে তা প্রাণঘাতী মহাজাগতিক-রশ্মিকে পৃথিবীর মাটিতে আসতে দেয় না—আটকে দেয়। কিন্তু চাঁদের বেলায় তা হচ্ছে না। চাঁদে যেতে হলে তাই বিশেষ পোষাক দরকার।

আর উল্কাপাত?—পৃথিবীর আকাশে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি নয় চাঁদের পিঠে। পৃথিবীতে উল্কাকে আমরা বলি তারা-খসা। বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি।

মহাশূন্যে অসংখ্য বস্তুকণা আছে। বস্তুপিণ্ড আছে। তার হিসাব কেউ জানে না। এগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্যের চারদিকে বা মহাকাশে অন্যপথে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। এই ঘুরতে ঘুরতে কোন এক ঝাঁক বস্তুকণার কাছে এসে গেল পৃথিবী। পৃথিবী তখন লাগায় টান। এই টানের জোরে সেইসব বস্তুকণা বা বস্তুপিণ্ড ছুটে চলে আসে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। যেমন ছুটে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে যায় অমনি সেই ঢুকে-

যাওয়ার প্রচণ্ড গতিবেগে বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে। আমরা একে বলি তারা খসা। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কত যে উলকা এসে পড়ে পৃথিবীর পিঠে আমরা তার খোঁজ রাখতে পারি। খোঁজ করা অসম্ভব ব্যাপার। কোনটা হয়ত আকারে সরষের চেয়েও ছোট।

আর এই উল্কাপাতটি যদি সামান্য বস্তুকণা না হয়ে বড় একটা বস্তুপিণ্ড হয়? তবে বিপদ—সাংঘাতিক বিপদ। যেমন হয়েছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত দেশের সাইবেরিয়ার জলা জায়গায়। সে এক ভয়ংকর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। সাইবেরিয়ায় ১৯০৮ সালে মানুষজন খুবই কম ছিল। তাতেই হাজার হাজার গৃহপালিত পশু আর মানুষ প্রাণ হারায়। আর ওঠে প্রচণ্ড ঝড়—এই উল্কাপাতের ফলে। সেই ঝড়ে আট কোটি গাছ মাটির বাঁধন ছিঁড়ে খড়-কুটোর মত উড়ে চলে যায়। কী ভীষণ কাণ্ড—প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। এমনি আরও কয়েকটা বড় বড় উল্কাপাতের খবর আছে।

কিন্তু, চাঁদের উল্কাপাত? তা আবার অন্যরকম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তো উল্কাপাতকে আটকে দেয়। একটা-দুটো বড় বড় পিণ্ড হয়তো মাটিতে এসে আছড়ে পড়ল। অন্য সবগুলি বায়ু-মণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে পুড়ে ছাই হল, নয়তো সরষের মত ছোট হয়ে গেল—তাই রক্ষে। কিন্তু চাঁদে তা হওয়ার উপায়টি নেই। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। উল্কাকে বাধা দেয় কে? তাই নিঃশব্দে, বিনা বাধায় চাঁদের পিঠে হাজারে হাজারে লাখে লাখে উল্কাপাত ঘটে চলেছে। চাঁদের মাটি যে এমন ফুটি-ফাটা ফাটল-ওয়ালা আর তাতে প্রচুর খানা-খন্দ গহ্বর ইত্যাদি—এরও কারণ নাকি অজস্র উল্কাপাত। তবেই—চাঁদ মাটিতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ান বা বসবাস করা মোটেই সহজ ব্যাপারটি নয়। এই হ'ল চাঁদের দেশ—মোটেই আমাদের পৃথিবীর মত খুব সুবিধের নয়।

চতুর্থ পর্ব

পৃথিবী ছাড়িয়ে যাত্রা

পৃথিবীতে আমরা থাকি। চোখ তুলে তাকালেই মাথায় ওপরে আকাশ। নীল আকাশ আমাদের মাথার ওপরে যেন চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। ভোর হতে না হতে লাল টুকটুকে সোনার সূর্য। ক্রমশঃ বেলা বাড়ে—দুপুর হয়। সূর্য তার উত্তাপ দিয়ে, আলো দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। ক্রমশঃ বিকেল, তারপর রাত। রাতে লক্ষ লক্ষ তারা আকাশে জ্বলজ্বল করে। এরপর আছে চাঁদ—কী সুন্দর, রূপালী থালা যেন। স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবী দেয় ভরিয়ে।

এই যে-সব গ্রহ, তারা—এরা কারা? এদের রূপ কি? মানুষের মন যুগ যুগ ধরে তা জানতে চেয়েছে। মানুষ আকাশে অভিযান করার স্বপ্ন দেখেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। মানুষের মনটাই এমনি—অজানাকে জানতে চায়। কেবল জিজ্ঞাসা করে—কী, কেন?—এইসব। আকাশ নিয়ে এই জিজ্ঞাসা মানুষের চলে এসেছে বহু শতাব্দী ধরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের দিকে নানা প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছেন। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। পেয়েছেনও প্রচুর উত্তর। তারা জেনেছেন নীল আকাশ মোটেই নীল পর্দা নয়। নীল আকাশ হল শূন্য—মহাশূন্য। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। এই মহাশূন্যে ভেসে ভেসে বেড়াছে, কোটি কোটি নক্ষত্র আর গ্রহ। সূর্য এমনই একটি নক্ষত্র। পৃথিবী তার গ্রহ। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। এতো সামান্য ব্যাপার, ছোট সংসার। এমনি সংসার কোটি কোটি। এই কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।

আমরা পৃথিবীর বিষয়ে কতটুকুই বা জানি। এই তো সেদিন পৃথিবীটাকে মানুষ অখণ্ডভাবে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে পৃথিবীর আকৃতিটাকে সার্বিকভাবে জানা গেল। সেই আমরা —ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু খোঁজ সংগ্রহ করতে পেরেছি।

মানুষ এতে সন্তুষ্ট নয়। মানুষের আশা আছে—জানার আশা, দেখার আশা চোখে দূরবীণ এঁটে পৃথিবীতে বসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কিলোমিটার দূরের গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে কতটুকু জানা যায়। তাই আন্দাজ আর অনুমানকে বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানাই ভাল। ভালো ত বটে।—তবে যে যেতে হয় গ্রহ-গ্রহান্তরে। মানুষের প্রাতজ্ঞা, যেতেই হবে—গ্রহ-গ্রহান্তরে যেতেই হবে। ঐ নিঃসীম শূন্য—ওখানে কী আছে? ওখানে তো পাড়ি জমানো যাচ্ছে না। তাই মানুষের স্বপ্ন, মানুষের কল্পনা আর বাসনা। মানুষ বাস্তবে না পারলে কল্পনা করে। এটা মানুষের মনের ধর্ম। তাই রামায়ণে-মহাভারতে দেখা যায় এই প্রকার কল্পনা মানুষের মন জুড়ে বসে আছে। শুধু কী তাই? এইচ. জি. ওয়েল্‌স, জুলেভার্নে, এডগার আলেন পো প্রমুখ সাহিত্যিকগণ কল্পনায় কল্প-কাহিনী রচনা করে মহাকাশ আর গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসব কল্প-কাহিনী এখন ফেলে আসা দিনের কথা।

বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষের বিষয়ে তাঁর তত্ত্বে বলেছেন টান আর ছুটের কথা। এই টান এড়িয়ে ছুট দিতে পারলেই হবে। উদ্ভট কল্পনাকে তবেই বাস্তবে রূপান্তর করা যায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে বসলেন এক অখ্যাত স্কুল শিক্ষক।

এই অখ্যাত স্কুল শিক্ষকের নাম কনস্তান্তিন সিওলকভস্কি। রুশ দেশে তাঁর জন্ম। রুশ দেশে তখন জারের রাজত্ব চলছে—বিপ্লব হয়নি। সিওলকভস্কি খুবই দরিদ্র, যেমন সে সময়

রুশ দেশের শিক্ষকেরা ছিলেন। তবুও সিওলকভস্কি দমে যাননি। তিনি তাঁর অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে বহুদিনের কল্পনাকে বাস্তব-রূপ দানের সাধনার মেতে রইলেন। সিওলভস্কির আগে মহাকাশ সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্য জানা গিয়েছিল। তিনি সেগুলিকে নিয়ে দিন-রাত গবেষণা করলেন। মহাকাশ যাত্রায় বহু সমস্যা। তিনি মূল সমস্যাগুলির সমাধান করে পরিকল্পনা রচনা করলেন। কিন্তু, তখন তো জারের আমল। তিনি হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখার কোন সুযোগই পেলেন না। কোন সুযোগ তিনি না পেলেও, তিনিই হচ্ছেন মহাকাশ অভিযানের জনক।

এই মহাবিজ্ঞানী তো তাঁর সব পরিকল্পনা রেখে গিয়েছিলেন। এরপর ১৯১৭ সানে রুশ দেশে বিপ্লব হল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবই পাল্টে গিয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। সাধারণ মানুষ পেল সব রকম অধিকার। এর পর শুরু হল অবহেলিত মহাবিজ্ঞানী সিওলকভস্কির উপেক্ষিত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা। আর তারই ফলে মহাকাশে পৃথিবীর মানুষের বিজয়-পতাকা উড়ল। এই দিনটা হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর! এই তারিখে সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞানীদের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক—১ রকেটে চেপে উঠে গেল মহাকাশে আর শুরু করে দিল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে।

মহাকাশ ফুঁড়েঃ বিজ্ঞানী সিওলকভস্কি বললেন মহাকাশ ফুঁড়ে উঠতে গেলে একমাত্র উপায় হল রকেট। মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে পৃথিবীর টান হল মস্ত বাঁধন। এই বাঁধনকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে না পারলে পৃথিবীর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এটা পারে একমাত্র রকেট। এই রকেটের পরিকল্পনা হল সিওলকভস্কির। রকেট তো আসলে উড়নতুবড়ির বিরাট এক

রাক্ষুসে রূপ। মাথা আঁটা একটা খোলের ভিতরে কোন একটা পদার্থ পুড়ে গ্যাস তৈরী হচ্ছে, এই গ্যাস সৃষ্টি করছে চাপ, চাপ সৃষ্টি করছে গতি। এই হল উড়ন-তুবড়ি। রকেটও তাই।

তা হলে এই যে গ্যাসর চাপে গতি সৃষ্টি করা—এই গতি কতটা প্রয়োজন পৃথিবীর বাইরে যেতে হলে, সেই হল কথা। পৃথিবীর বাইরে কোন বস্তুকে পাঠাতে হলে সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার বেগের ছুট দিয়ে দিতে হবে বস্তুকে। কারণ এই গতিবেগ না হলে পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। তাই মহাকাশে যাবার রকেট তৈরি করার জন্য বহু বছর ধরে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল।

কিন্তু, আর একটা বাধা, তা হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মাটি থেকে ওপর দিকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত জড়ো হয়ে আছে পৃথিবীর শতকরা নব্বুই ভাগ বাতাস। কোন বস্তুকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় বার কিলোমিটার বেগে ছুট দেওয়ার জন্যে প্রচণ্ড ধাক্কা দেওয়া হল পৃথিরীর মাটি থেকে। বস্তুটি যতই ওপরে উঠবে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতে তার গতি বেগ ক্রমশ যাবে কমে।

বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা খেয়ে গতিবেগ কমে যাওয়ার ব্যাপারটাও আবার কাজে লাগে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে গেলে। মহাকাশে যেতে হলে প্রথমে এই পনেরো কিলোমিটারের মত ঘন বায়ুস্তরের পরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত হালকা বায়ুস্তর। সব নিয়ে দু-শো কিলোমিটার পর্যন্ত এই বায়ুস্তর। এর পর বায়ু খুবই হালকা। যতই ওপর দিকে উঠতে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ যায় ক্রমশঃ কমে। কমতে কমতে দুশো কিলোমিটারের পরে এমন একটা অবস্থা আসে যে বায়ুর চাপ এর পর বিশেষ কিছু থাকেই না।

বায়ুর চাপই শুধু নয়, পৃথিবীর টানও ক্রমশ যাবে কমে।

চার-শো কিলোমিটার উঁচুতে পৃথিবীর টান দশ ভাগ কমে। এইভাবে পৃথিবীর মাটিতে যে বস্তুর ওজন এক টন, এক লক্ষ কিলোমিটার দূরে সেই বস্তুর ওজন পাঁচ কিলোগ্রাম। তার মানে পৃথিবীর মাটি থেকে যত দূরে কোন জিনিস যাবে ততই তার যাওয়ার পথে ওজন কমতে থাকবে।

এতো হল পৃথিবীর বাইরে যাওয়া। কিন্তু পৃথিবীর চার দিকে বেড় দিয়ে ঘুরে বেড়ান হয় কী করে? প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে রকেট ছুটল মহাকাশে। আবার গতি সৃষ্টি করে বেঁকতে, বেঁকতে এবং রকেটের মাথায় বসান উপগ্রহটিকে পাঠিয়ে দিল পৃথিবীর সমান্তরালে। এবার উপগ্রহটি চাঁদের মত পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ঘুরতে সুরু করবে।

এটা হল কী করে? বিজ্ঞানী নিউটন আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে কোন বস্তু যদি পৃথিবীর সমান্তরালে ছুটতে থাকে তবে সেই বস্তু একই দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে প্রাদিক্ষণ করতে থাকবে।

কেন এমনটি হয়?—পৃথিবীর আকার তো ন্যাসপাতির মতো গোল। পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণের টানে সব বস্তুকে মাটিতে নামাতে চায়। ছুটন্ত বস্তুটাকেও টেনে নামাতে চাইবে। আর এই ছুটন্ত বস্তুটিকে যতটা টেনে নামাবে, পৃথিবীর পিঠটা ঠিক ততটা ঢালু। তাই সেই বস্তুটি পৃথিবীর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে না—ঘুরতেই থাকবে। অবশ্য—বায়ুমণ্ডলের ধাক্কায় ধাক্কায় গতি যদি সেকেণ্ডে আট কিলোমিটারের চেয়ে কমতে থাকে, তবে পৃথিবীর মাটিতে একদিন মুখ থুবড়ে পড়বেই।

এই সব বিষয়গুলিকে নিয়ে গবেষণা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রথমে সোভিয়েতের মানুষ মহাকাশে মানুষের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিল। ১৯৫৭ সলের ৪ঠা অক্টোবর কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক—১ রকেটে চেপে মহাকাশে উঠে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সুরু করল।

রকেট ঃ মহাকাশে যেতে হলে চাই ছুট। এই ছুট হল প্রচণ্ড ছুট। এমন ছুট হওয়া চাই যাতে পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই কথাই বলেছেন সিওলকভস্কি। কে এই টানকে ছিঁড়তে পারে?—রকেট, একমাত্র রকেট। কিভাবে এই রকেট তৈরী হয়, একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

উড়ন-তুবড়ি কীভাবে আকাশে উঠে যায়? ভিতরে থাকে বারুদ। বারুদে আগুন দিলে গ্যাস তৈরি হয়। এই বারুদ হল জ্বালানী। এই বারুদরূপ জ্বালানী ধাক্কা দেয় পিছন দিকে। তুবড়িও তখন আকাশে উড়ে যায়।

এবার ভেবে নেওয়া যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উড়ন-তুবড়ির ধাক্কা এক সঙ্গে করা হল। তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় ভাবনা করার মত। এই ধাক্কা হবে প্রচণ্ড। এই ধাক্কার চোটে তুবড়ির খোল উল্টো মুখ করে ওপর দিকে ছুটল। হাউই বাজিও এমনিভাবে আকাশের ওপর দিকে ছুটে চলে। রকেটও এই ধাক্কার ঠেলাতে ওপরে উঠে যায়। অথবা বলা চলে ছুট তৈরি হয় রকেটের। তবে, মহাকাশযানকে মহাকাশে পেঁছে দিতে ব্যবহার করা হয় তরল জ্বালানী। তরল জ্বালানী মুহূর্তে পুড়ে গিয়ে বিপুল পরিমাণ গ্যাস তৈরী হয়। কঠিন জ্বালানী দ্বারা তা হতে পারে না।

এবার প্রশ্ন হল—অক্সিজেন ছাড়া কোন কিছু জ্বলতে পারে না। তাই তরল জ্বালানীর সঙ্গে রকেটেই বোঝাই করা হয় তরল অক্সিজেন।

এতো হ'ল ধাক্কা দেওয়ার ব্যাপারে তরল জ্বালানীর ব্যবহার। কিন্তু, ধাক্কা কিভাবে দেওয়া হলে রকেট ওপর দিকে ছুটবে —প্রশ্ন থেকে যায়। তাই উদাহরণ দিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

আমরা একটা ট্রলি গাড়িতে বেশ কিছু পাথর বোঝাই করে

বসে গেলাম রেললাইনের ওপরে। এবার যত ক্ষমতা আছে, ততটা জোরে একটা পাথর ছুঁড়ে দেখা গেল গাড়িটা একটু পিছিয়ে পিছন দিকে চলে এসেছে। এবার আরেকটা পাথর না ছুঁড়লে গাড়ীটা একটু পেছিয়েই থেমে যাবে। থেমে যাওয়ার আগে আবার পাথর ছোঁড়া হল। গাড়ী চলতে লাগল। আবার ছোঁড়া হল—আবার ছোঁড়া হল—গাড়ি চলল পিছন দিকে। এইভাবে না থেমে যদি একের পর এক সমস্ত শক্তি দিয়ে পর পর পাথর ছোঁড়া যায়, তবে গাড়ি পিছন দিকে চলতেই থাকবে। কিন্তু এই পাথর ছুঁড়ে চলার একটা সীমা আছে গতিরও একটা সীমা আছে। এবং হিসাবটা হল গাড়ি এবং আর যে পাথর ছুঁড়ে চলেছে তার ওজন যোগ করতে হবে। সেই ওজনকে ২·৭২ দিয়ে গুণ করে যে যোগফল পাওয়া যাবে, পাথরের ওজন তত হলে গাড়ি ছুটবে বত্রিশ কিলোমিটার বেগে। মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে বাড়ান যায় না। কিন্তু রকেটের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে বহু—বহুগুণে বাড়ান চলে।

রকেটও ঠিক এমনিভাবে ছুটে চলে। যতক্ষণ রকেটের ভিতরের জ্বালানী গ্যাস তৈরী করে ধাক্কা দিতে সুরু করে বা বস্তুকণা ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকে—রকেটও ছুটতে থাকে। তবে, এই ধাক্কাটা কোথায় দিচ্ছে—বায়ুমণ্ডলে না অন্য কোথাও দেখা যাক। রকেটের ভিতরে ভর্তি করা আছে জ্বালানী। এবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটান হল সেই জ্বালানীতে। ভিতরের খোলের (মোটর) চারদিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ফলে চাপ সৃষ্টিও হল। মোটরের মাথার দিকে কোন ফাঁক রইল না, যেমন উড়ন-তুবড়ির থাকে না। এতে করে ভিতরের সব জায়গায় চাপ হবে সমান। কিন্তু, পিছন দিকে রাখা হল গর্ত ফুটোও। ভিতরের ফুলেওঠা গ্যাস সেই গর্ত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাইরে আসতে থাকে। কিন্তু তাতে মাথার দিকে চাপ একই থেকে যায়, পিছন দিকে কমে যায়।

এই চাপ মাথার দিকটাকে ধাক্কা দিতে থাকে, ঠেলতে থাকে। তখন রকেট এগিয়ে চলে। এই ধাক্কা বা ঠেলা যত জোর হবে রকেট ছুটবে তত দ্রুত। তা হলে দেখা যাচ্ছে, রকেটের পিছন দিয়ে গ্যাস যেভাবেই বেরিয়ে আসুক না কেন, তাতে বাইরে কিছুতে ধাক্কাদেওয়া হয় না। এই ধাক্কাটা আসে ভিতর থেকেই। বায়ুমণ্ডল না হলেও চলবে। অক্সিজেন জ্বালানী হিসাবে দরকার। তা তরল জ্বালানী তো রকেটের ভিতরেই ভর্তি করা আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—রকেট ছুটে চলে ভিতরে গ্যাসের চাপ এবং পিছন দিকের ফুটো দিয়ে গ্যাস বাইরে চলে আসার জন্যে। এই বেরিয়ে আসা গ্যাস কোনো কিছুকে ধাক্কা বা ঠেলা দিক বা না দিক তাতে রকেটের ছুটে চলার ক্ষেত্রে কিছুই এসে যায় না।

তা হলে জানা গেল—উড়ন-তুবড়ি, হাউই এসব বাজির গ্যাস পিছন দিকে বায়ুকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তা ঠিক না। বায়ুতে অক্সিজেন থাকে। অক্সিজেন জ্বালানির জন্য প্রয়োজন—অন্য কারণে নয়। ভিতরের ঠেলাতেই এরা আকাশে উঠছে। তবে রকেটের সঙ্গে এইসব বাজির একটা পার্থক্য আছে। রকেটের জ্বালানী ভিতরে থাকলেও অক্সিজেন থাকে বাইরের বায়ুমণ্ডলে। চাপ সৃষ্টি করার জন্যে হাউই, উড়ন-তুবড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তেমনি রকেটের ভিতরে, বিস্ফোরণ ঘটান হয়। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধাক্কা বা ঠেলা তৈরী করা হয়।

মোটরের মধ্যে বা উড়ন-তুবড়ির বারুদে বিস্ফোরণ ঘটানো অথবা আগুন দিয়ে দেওয়া হল। এবার হবে কি—ভিতরে গ্যাস প্রচণ্ড-ভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠবে। ফুলে-ফেঁপে উঠে চারদিকের দেওয়ালে ধাক্কা দিতে থাকবে। মাটি দিয়ে বন্ধ করা অংশে গ্যাস বাইরে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। তখন প্রচণ্ড চাপ দিয়েও বেরিয়ে আসতে পারবে না। চাপ থেকেই যাবে। ভিতরের গ্যাস বাইরে আসার —অংশের ফাঁক দিয়ে গ্যাস সহজেই প্রচণ্ড বেগে বাইরে চলে

আসে। তাই এই অংশে কোন চাপ থাকে না। কিন্তু মাটি দিয়ে বন্ধ করা অংশে প্রচণ্ড চাপ খোলকে বা রকেটের মোটরকে ঠেলতে থাকে। এই ঠেলার জন্যে গতি সৃষ্টি হয়। উড়ন-তুবড়ি এবং রকেট তখন ছুটে চলে। গ্যাস যত বেশি বেগে বেরিয়ে আসে যাকে বলে রকেটের নিঃসরণ—রকেট তত বেশি বেগে ছুটতে থাকে।

রকেট তৈরির কলাকৌশল ঃ 'রকেট' বলতে যা বুঝায় সে-বস্তুটি প্রথম কোন দেশে কবে তৈরি হয়েছিল তা সঠিক জানা যায়নি। তবে, তের শতকে চীনদেশে বারুদের ব্যবহার ছিল। তারা যুদ্ধে ছুঁড়ে-মারা যায় এমন এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত। এই অস্ত্র ছুঁড়ে মারা হত দূর থেকে। তবে, কীভাবে তা তৈরি করা হত অথবা ব্যবহার করা হত তার সঠিক বৃত্তান্ত কিছু নেই।

পৃথিবী বিখ্যাত লেখক জুল ভার্ন-এর কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক বই 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' প্রকাশিত হয়, ১৮৬৫ সালে। নিউটনের তত্ত্ব তার জানা ছিল। তিনি তাঁর চন্দ্রে অভিযানের নায়ককে সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে সঠিক ভাবেই চাঁদের দিকে পাঠিয়েছিলেন তার গ্রন্থে। পাঠিয়েছিলেন—কামান দেগে। শূন্যে ভারহীনতার কথাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু রকেটের কোন কথা নেই তাঁর গ্রন্থে।

মহাকাশ অভিযানের জনক রুশ দেশের শিক্ষক কনস্তানতিন সিওলকভস্কিই প্রথম রকেটের পরিকল্পনা করেন। তিনি বলেছেন —বায়ু না থাকলেও রকেট ছুটে চলতে পারে। মহাশূন্যে বায়ু নেই, তাই রকেটই হল একমাত্র যান। কঠিন জ্বালানি অপেক্ষা তরল জ্বালানি অনেক বেশি উপযোগী। তরল জ্বালানিতে রকেট অনেক বেশি গতিলাভ করতে পারে।

এর পর আমেরিকার বিজ্ঞানী ডঃ আর এইচ. গডার্ড ১৯২৬ সালে রকেট তৈরি করলেন। তাঁর রকেট ঘণ্টায় ৯৬ কিলোমিটার বেগে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। এই ঘটনার পর রকেট

নিয়ে নানা গবেষণা সুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে দূর থেকে বোমা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রকেট ব্যবহৃত হয়। জার্মানদের এই ধরনের রকেট বাহিত বোমা ৩২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছিতে পারত। আর এখন—এই ধরনের আরও কত যে মারণাস্ত্র দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে তার সংখ্যা বলা কঠিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর ইউরোপের নানা দেশ তো এইসব নিয়েই উন্নতি করেছিল। এদিকে সোভিয়েত সারা পৃথিবীর মানুষকে হতবাক করে দিয়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করলেন। কী করে যে সম্ভব—দুনিয়ার মানুষ তা স্বপ্নের তখন ভাবতে পারেনি। সারা জগতকে স্তম্ভিত করে দিয়ে স্পুটনিক—১ পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল—১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই দিনটি থেকেই সুরু হল মহাকাশ অভিযানের যুগ। আর এই যুগের বাহক হল রকেট।

এতো গেল রকেটের ইতিহাস। কলা-কৌশলটা কেমন এবার আলোচনা করে দেখে নিতে হয়।

রকেটের মধ্যে দুটি পৃথক পৃথক কামরা থাকে। একটায় থাকে জ্বালানি অন্যটায় থাকে অক্সিজেন। এর পরেই থাকে একটা পাম্প। পাম্পের সাহায্যে তরল জ্বালানি আর অক্সিজেন পরের অংশে থাকা মোটরে নিয়ে আসা হয়। এখানেই তরল জ্বালানিতে বিস্ফোরণ ঘটান হয়। এই জ্বালানি তরলও হতে পারে, কঠিনও হতে পারে। কঠিন জ্বালানি হল জ্বালানির গুঁড়ো আর অক্সিজেনের মিশ্রণ। এই মিশ্রণ—আবার কাদা-কাদা মতও হতে পারে। তবে তরল জ্বালানিতে, রকেটের গতিবেগ কঠিন জ্বালানির চেয়ে অনেক বেশি হয়। কারণ হল—গ্যাস নিঃসরণ বা বেরিয়ে আসার গতিবেগ অনেক বেশি হয় তরল জ্বালানিতে। বর্তমানে রকেটের গতিবেগকে দ্রুততর করার জন্য জ্বালানি হিসাবে

ব্যবহার করা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি। তরল জ্বালানিতে গতিবেগ বৃদ্ধি করা বাদ দিয়েও অন্য একটি সুবিধা আছে। তাহল প্রয়োজনে এই গতিবেগকে কমান যায় এবং বৃদ্ধিও করা যায়। কিন্তু কঠিন জ্বালানিতে তা সম্ভব হয় না।

রকেটের গতি সম্পন্ন হয় ঠেলা-র ওপরে। ঠেলা যত বেশি হবে, গতিবেগও তত বাড়বে। রকেটের ইঞ্জিনের মধ্যেই গ্যাসের চাপ থেকে ঠেলা সৃষ্টি হয়। ভিতরের গ্যাস বহির্গমনের পথ দিয়ে যত বেগে নিঃসরিত হবে, তত বেশি বেগ তৈরি হবে। আবার এই গ্যাস নিঃসরণ নির্ভর করছে কী হারে জ্বালানি পুড়ছে তার ওপরে। এই থেকেই রকেটের গতি।

আমরা ঘুষির ওজন মেপে বলে দিতে পারি, ঘড়ির গতিবেগ মাপারও মিটার আছে। তেমনি রকেটের ইঞ্জিনের মধ্যে কী পরিমাণ ঠেলা তৈরি করা গেল তাও মাপতে হয়, জানতে হয়। পাউণ্ডের হিসাবে রকেটের ঠেলা মাপা হয়। গাড়ির গতির মাপ যেমন ঘণ্টায় এত মাইল বা এত কিলোমিটার—তেমনি আর কি। ঠেলা তৈরি হলে এখন, কতটা ব্যোমযানকে পৃথিবীর টান কাটিয়ে মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে—এর হিসাব আছে। এবার এই ব্যোমযানের ওজন যদি রকেটের ঠেলার ওজনের চেয়ে বেশি হয়, তবে ব্যোমযান তো পৃথিবীর মাটি কামড়ে বসে থাকে। তাহলে, ঠেলার ওজন বেশি হতে হবে ব্যোমযানের ওজনের চেয়ে। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন না ঠেলা কম হলে চলবে না, তেমনি যানের ওজনও কম রাখতে হবে। যানের ওজন বেশি করতে অনুপাতে জ্বালাণির ওজনও বেশি হবে ব্যোমযানে। তবে পৃথিবীর কক্ষে একবার চলে গেলে আর এত বেশি ঠেলার প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে ভারশূন্য অবস্থা—কয়েক পাউণ্ড ঠেলা তৈরি করলেই চলে যাবে। এই ঠেলার পরিমাপ করা হয় যে কথায়, তা হল—'নির্দিষ্ট ঘাত'। মোটর গাড়ির ঠেলায় বলা হয়—একে পঁচিশ কিলোমিটার যায়।

রকেটের ঠেলায় বলা হয়—এত সেকেন্ডে 'নির্দিষ্ট ঘাত'। তরল পেট্রোল ও অক্সিজেন পুড়িয়ে নির্দিষ্ট ঘাত হল ৩০০ সেকেন্ড। আর, তরল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পুড়িয়ে নির্দিষ্ট ঘাত হল ৪০০ সেকেন্ড। নিউক্লিয়ার রকেটের নির্দিষ্ট ঘাত অনেক বেশি, তা হল ১০০০ সেকেন্ড। ফোটন রকেটের নির্দিষ্ট ঘাত হবে বিপুল পরিমান। যার ফলে এই রকেট আলোয় গতিবেগ নিয়ে মহাকাশে ছুটবে। তবে ৪০০ সেকেন্ডের নির্দিষ্ট ঘাতের রকেটে করে সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চাঁদকে জয় করেছেন, অন্যান্য গ্রহে এবং গ্রহ ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে ব্যোমযান পাঠিয়েছেন।

তবে, এইসব ব্যোমযানে ব্যবহার করা হয়—ধাপ-রকেট। এই রকেট বিভিন্ন স্তরে বা ধাপে ধাপে সাজান। কেন বা কি সুবিধার জন্য এগুলি করা হয় তা জেনে নিতে হবে।

স্তর-রকেট বা ধাপ-রকেট ঃ মহাকাশ অভিযানের জনক সিওলকেভস্কি এই রকেটের নাম দিয়েছিলেন—রকেট রেলগাড়ি। রেলগাড়ির কামরা যেমন একটার পর আর একটি থাকে, তেমনি বলেই এই নাম। এই ধাপ রকেটের প্রয়োজন হয় মহাকাশ যাত্রায়। কারণ, রাসায়নিক জ্বালানির নিঃসরণ বেগ কম হওয়ায় রকেটের পক্ষে পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব পৃথিবীর টান কাটাতে হলে বেগ প্রয়োজন সেকেন্ডে ১১·২ কিলোমিটার। এই পরিমান বেগের জন্যে যে পরিমাণ জ্বালানি একধাপ রকেটকে বইতে হয় তা বিরাট ব্যাপার। সে হিসাব হল মহাকাশ যানের যাত্রি, নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম, বিভিন্ন কক্ষ, যন্ত্রপাতি, আরোহী ইত্যাদি সহ ওজন যদি এক টন হয় তবে জ্বালানি প্রয়োজন হবে ৯৯৯ টন। এই পরিমান জ্বালানি রকেটকে বইতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই প্রয়োজন ধাপ-রকেট।

পৃথিবীর বাইরে যেতে হলে বেগ প্রয়োজন প্রতি সেকেন্ডে

১১'২ কিলোমিটার। এই বেগের নাম নিষ্ক্রমণ—বেগ। এই বেগ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম ভাগ ৫'৬, দ্বিতীয় ভাগও ৫'৬ কিলোমিটার।

এবার রকেট হল দু'টো। একটা হল মূল রকেট, অন্যটি হল সহায়ক রকেট। মূল রকেটে থাকবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম। এবার প্রথমে সহায়ক রকেট চালু করা হবে। সহায়ক রকেট মূল রকেটকে নিয়ে অনেকখানি বেগ সঞ্চার করে অনেক উঁচুতে চলে আসবে। এক সময় এই সহায়ক রকেটের জ্বালানি শেষ হবে। জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই মূল রকেট চালু হয়ে যাবে এবং সহায়ক রকেট সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে খসে পড়ে যাবে। তা হলে মূল রকেটকে আর বেশি বোঝা বইতে হল না। এবার তাই মূল রকেটের নিষ্ক্রমন-বেগ বেড়ে যাবে অনেক।

এই হল স্তরে স্তরে সাজান ধাপ-রকেট এবং তার বিশেষ সুবিধা। এই স্তর দুটি না হয়ে তিনটিও হতে পারে, চারটিও হতে, পাঁচটিও হতে পারে। তা নির্ভর করছে যেমন প্রয়োজন তার ওপরে। চাঁদের দেশে স্যাটার্ন—৫ রকেটের সাহায্যে অ্যাপোলো ব্যোমযান পাঠান হয়েছিল। এই রকেট ছিল তিন-স্তরের বা তিন-ধাপের। সব নিয়ে এই ব্যোমযানের ওজনটা ছিল বার হাজার টনেরও বেশী উৎক্ষেপণের সময়। আর মূল যে অংশে চন্দ্র অভিযানের মডিউল, তার ওজন ছিল ৪৪ টন। আর, উৎক্ষেপনের সময় যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল সবকিছু মিলিয়ে তার উচ্চতা হয়েছিল একশত মিটারেরও বেশি।

এইসব কারণেই স্তরে-স্তরে ভাগ করা 'রেলগাড়ি—রকেট' বা ধাপ রকেটেই প্রয়োজন হয় মহাকাশ যাত্রায়।

পৃথিবীর কক্ষে পাক খাওয়া ঃ কোন বস্তুর গতিবেগ যদি সেকেন্ডে ১১'২ কিলোমিটার হয় তবে সেই বস্তু পৃথিবীর টান কাটিয়ে পৃথিবীর বাইরে যেতে পারে। কিন্তু এই গতিবেগ

সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটারের কম হলে আবার সেই বস্তুটি পৃথিবীর টানে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসবে। আবার সেই বস্তুটি পৃথিবীর কক্ষে পাক খেতে পারে, মহাকাশে উধাও হতেও পারে। কীভাবে মহাকাশে উঠে পৃথিবীর চার দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাক খায়?

পৃথিবীর মাটি থেকে কোন বস্তুকে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলো-মিটার বা ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুট দিয়ে দিতে পারলে তা পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে চলে যায়। আবার, এই বেগ যদি কম হয় তবে বস্তুটি পৃথিবীতে ফিরে আসে। এখনও হয়, বস্তুটি ফিরে না এসে পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খেতে থাকে। এই পাক খাওয়া চলে বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার কক্ষে। সূর্যের চারদিকে প্রতিটি গ্রহ যেমন উপবৃত্তাকার কক্ষে পাক খেয়ে চলেছে। এই রকম পৃথিবীর কক্ষে যখন কোন উপগ্রহ পৃথিবীর কাছে থেকে পাক খায় তখন তার গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ—কোন বস্তুকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খাওয়াতে হলে তার গতিবেগ প্রয়োজন হয় ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার। আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবীর কক্ষপথে কম-বেশি এই চক্রবেগ নিয়েই পাক খেয়ে চলেছে।

এবার বিষয়টা একবার নতুন করে বুঝে নিতে হয়।

ধাক্কা দিয়ে কোন মহাকাশ যানের গতি সৃষ্টি করা হল। এর জন্য ব্যবহার করা হল স্তরে-স্তরে সাজানো রকেট। এবার এই রকেটকে দুরন্ত গতিবেগ নিয়ে কয়েকশ' কিলোমিটার উঠতে হবে। প্রচণ্ড পরিমান জ্বালানি বহন করতে যাতে না হয় এবং প্রয়োজনীয় গতিবেগ যাতে পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করা হয় ধাপ-রকেট। রকেটে ব্যবহৃত হয় তরল-জ্বালানি। এই বহু স্তরের রকেটের একটির জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে অন্যটি জ্বলে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে

ফুরিয়ে যাওয়াটি খসে পড়ে যায়। মহাকাশযানের ভারী খোল হাল্কা হয় এবং তখন ছুটে চলে আরও দুরন্ত গতিতে।

স্পুৎনিক—১ নিয়েই আলোচনায় দেখা যাক এর পর কী হয়েছিল! প্রথম রকেটটি খসে পড়ার পর প্রচণ্ড গতিতে স্পুৎনিক মহাকাশে ছুটল। এবার বেঁকতে বেঁকতে ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীর সমান্তরালে চলে এলে শেষ রকেটের স্তরটা পড়ল খসে। তখন সাড়ে তিরাশি কিলোগ্রাম ওজনের স্পুৎনিক—১ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হয়ে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীর চারদিকে বেড় দিয়ে ঘুরতে শুরু করে দিল।

তিনশ বছরের বেশি সময় হয়ে গেল, বিজ্ঞানাচার্য নিউটন বলেছিলেন—এমনিই হতে হবে। সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে কোন বস্তু যদি পৃথিবীর সমান্তরালে ছুটতে থাকে তবে তা ছুটেই চলবে—চিরকাল। চিরকাল একই দূরত্ব নিয়ে পৃথিবীর সমান্তরালে ছুটে চলার মানে হল পৃথিবীকে বেড় দিয়ে পাক-খাওয়া বা প্রদক্ষিণ-করা। স্পুৎনিক—১ তাই করেছে। অন্য উপগ্রহের শুধু নয়, সব বস্তুর ক্ষেত্রেই এমনি হবে। কিন্তু, কেন এমনটি হয়।

পৃথিবীর টান বা মাধ্যাকর্ষণ সব ছুটন্ত বস্তুকে নিজের বুকে টেনে নামাতে চায়। পৃথিবীর আকার হল ন্যাসপাতি ফলের মত গোলাকার। পৃথিবীর এই ছুটন্ত বস্তুকে যতটা টেনে নামাবে পৃথিবীর পিঠও হল ঠিক ততটা ঢালু। সুতরাং, সেই ছুটন্ত বস্তুটি অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর বুকে পড়েই চলবে—পড়েই চলবে। হাঁ, তবে কোন কারণে বা বাতাস যদি আঘাত করে করে বস্তুটার গতিবেগ সেকেণ্ডে আট কিলোমিটারের চেয়ে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে—তবে সেই বস্তু একদিন পৃথিবীর টানে পৃথিবীরই বুকে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে। পৃথিবীর নয়শ'

কিলোমিটারের ওপরে বাতাস নেই বললেই চলে। তাই স্পুটনিক-১ প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে নয়শ'রও বেশি কিলোমিটার ওপরে পাঠান হয়েছিল।

পৃথিবীর কক্ষপথে শেষ রকেটটি তো ব্যোমযানকে ঠেলে দিয়ে খসে পড়ে গেল। এবার কিন্তু ব্যোমযানের নিজস্ব গতিবেগ আর কিছু রইল না। ব্যোমযানটি এবার পৃথিবীর টানের জন্যেই অনন্তকাল ধরে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর কক্ষে পাক খেয়ে চলে। কিন্তু, এই ব্যোমযানের ছুটের বেগ যদি পৃথিবীর ছুটের বেগের চেয়ে কোন কারণে বেশি হয়ে যায় বা কম হয় তবে তা আর পৃথিবীর কক্ষে পাক-খেয়ে বেড়াবে না—গ্রহ গ্রহান্তরে যাত্রা করবে। এই অবস্থা সৃষ্ট করতে হয় অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে যেতে হলে।

মহাকাশে মানুষ: ১৯৫৭ সালে ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত উপগ্রহ স্পুটনিক-১ রকেটে চাপিয়ে মহাকাশে পাঠানোর পর সারা পৃথিবী অবাক হয়ে গেল। অনেকে বলল, আমরা বসে থাকি কেন—মহাকাশ অভিযানে লেগে যাই। এবার কোমর বেঁধে লেগে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একের পর এক তারাও কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে লাগল।

কিন্তু, উপগ্রহ পাঠিয়েই কী মানুষের সাধ মিটে যায়। অন্য গ্রহ-উপগ্রহে কী আছে জানতে হবে তো। আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের রূপটাই বা কেমন—বাইরে থেকে একটু নজর দিয়ে দেখবার সাধ মানুষের। তাই মানুষকেই যেতে হবে মহাকাশে, উপগ্রহের মাটিতে পা দিতে হবে, যেতে হবে গ্রহান্তরে। সেই প্রচেষ্টাই চলল দুই দেশে—সোভিয়েট আর আমেরিকায়।

এই তোড়জোড় ব্যবস্থা এক এলাহি কাণ্ড। রকেট তো ঘুরে এল, এবার তো মানুষ পাঠাতে হয়। কিন্তু, মানুষ? সে যে অনেক ঝামেলা—বিপদ। দেখতে হবে, জানতে হবে সব।

মহাকাশ যানের তো প্রাণ নেই, মানুষের যে আছে। আগে যার প্রাণ আছে তেমন কিছুকেই পাঠিয়ে দেখা যাক না কেন—সব ঝক্কি-ঝামেলা সইতে পারে কিনা। হ'লও তাই। প্রথমে পাঠান হল একটি কুকুর, তারপর পাঠান হল একটি বানরকে। এদের মহাকাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা হ'ল জীবন্ত অবস্থায়। স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ যানের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে নিরাপদে অবতরণ করান হয় মহাকাশ যানকে।

এবার পাঠাতে হবে মানুষকে। কিন্তু, মহাকাশে মানুষ পাঠাতে হলে সমস্যা প্রচুর, বিপদ প্রচুর। দুরন্ত গতিতে শূন্যে মহাকাশযান ছুটে চলবে, কয়েশ' কিলোমিটার ওপরে উঠতে হবে তাকে। যেনে শূন্য—মহাশূন্য। শুধু শূন্য নয়—নিঃশব্দ শূন্যতা যেখানে! তারপর আরো—ভর-শূন্যতা। সেখানে নিরন্তর পড়েই চলতে হবে। পড়ে চলার সময় কোন ওজন থাকে না যে। এইভাবে ছোটার জন্যে চাই অসীম মনোবল আর সাহস। চাই—বুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতা। এই গুণগুলি থাকা চাই মহাকাশচারীর। একই মানুষের এতগুলি গুণ একসঙ্গে থাকা খুবই কম দেখা যায়। তাই মানুষ বাছাই করে নিয়ে তাদের দিনের পর দিন চলল নানা রকমের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দেওয়া।

শেষ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। মানুষের জয় ঘোষিত হল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রুশ মহাকাশচারী ইউরি গাগারিন পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে মহাকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৃথিবীর মানুষকে শুভেচ্ছা জানালেন বেতারে। ভোস্তক—১ মহাকাশযানে চেপে তিনি পৃথিবীকে মাত্র ৮৯ মিনিটে একবার প্রদক্ষিণ করলেন। মাত্র ৮৯ মিনিটেই ভোস্তক—১ মহাকাশযানের বা গাগারিনের কেটে গেল একটি রাত ও একটি দিন। কী করে ৮৯ মিনিটে একটি রাত এবং একটি দিন হল।

বুধবার সকাল নয়টায় তিনি রুশদেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন। অর্থাৎ সূর্যের দিকে বুক ফেরানো পৃথিবীতে তখন বুধবার সকাল ন'টা। সূর্যের আলোয় আলোকিত দিন তখন। এবার তিনি আলোকিত অংশ ৪৪.৫ মিনিটে অতিক্রম করে চলে গেলেন



য়ুরি গাগারিন, মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম নভশ্চর। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে তিনি ভোস্তক-১ ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমা করেছিলেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে। সেখানে তখন মঙ্গলবার—বুধবার হয়নি। রাশিয়া থেকে সকালে যাত্রা করে আমেরিকার ওপর দিয়ে তিনি যখন চলেছিলেন তখন রাত। পৃথিবীর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পিঠ পেরিয়ে যেতে তার সময় লেগেছিল ৪৪.৫ মিনিট। এ যেন কেমন এক অসম্ভব ব্যাপার! তাহলে মানুষ তার ফেলে আসা সময়ের ওপর দিয়েও একবার ঘুরে আসতে পারে!

দিনের পর দিন নানা রকমের শিক্ষা আর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে গাগারিন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তিনি যখন ব্যোমযানে চেপে প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে উঠছেন, তখন কে যেন তাকে প্রচণ্ড চাপে আসনের সঙ্গে

পিষে ফেলতে চাইছিল। এ হ'ল পৃথিবীর প্রচণ্ড টান। পৃথিবী তার ব্যোমযানকে টেনে ধরে রাখতে চাইছিল। এই মহাকর্ষের টান কাটিয়ে যখন পৃথিবীর কক্ষপথে সমান্তরালে প্রবেশ করলেন, তখন আবার অন্য অবস্থা। এখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভারশূন্য। কোন কিছুরই ওজন নেই। যেখানে যা রাখা হচ্ছে সেখান তা তা থেকে যাচ্ছে। শূন্যে খাবার-দাবার জিনিসপত্র যা খুশি রাখা যাচ্ছে—শূন্যেই তা থেকে যাচ্ছে, পড়ছে না কোথাও। একেমন ভূতুরে-ভূতুরে মনে হবে মর্তের মানুষের কাছে। কারণটি হল, পৃথিবীর সমান্তরালে যাওয়া মানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে সব সময়ে পড়ে চলে। নীচের দিকেই তো পড়ে চলা—সব সময়েই পড়ে চলা। যতটা পড়া, পৃথিবীর ঢল ততটা। আমরা যখন শূন্যে থাকি বা নীচে পড়তে থাকি তখন আমাদের ওজনের কোন বোধ থাকে না। ধুপ্ করে মাটিতে এসে পড়লে পরেই ব্যথা পাই আমরা। কিন্তু নীচে পড়ার সময় ওজনের কোন বোধ থাকে না। এই অবস্থা হয়েছিল গাগারিনের, যখন তিনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছিলেন।

এইভাবে মহাকাশে ১০২ মিনিট কাটিয়ে গাগারিন ভোস্তক—১ মহাকাশের গতি কমিয়ে আনেন রেট্রো রকেটের সাহায্যে। গতি কমাতেই মহাকাশযান পৃথিবীর দিকে চলে আসতে শুরু করল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকেই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে হল প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে মহাকাশযানের বাইরের দিকের আবরণে ধরে গেল আগুন—লক্‌লকে আগুনের শিখা। এমনি হওয়ার কথা। তাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকে মহাকাশযানের মধ্যে। এই যন্ত্রের ব্যবস্থার সাহায্যে ভিতরের তাপমাত্রা যে ২০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে ছিল, তাই রয়ে গেল। তারপর—বিশ্বের মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে ইউরি গাগারিন অক্ষত শরীরে পৃথিবীর মাটিতে আবার ফিরে এসে মানব ইতিহাসে এক নতুন জয়ের অধ্যায় যুক্ত করে দিলেন।

এরপর দুই দেশে—সোভিয়েতে ও আমেরিকায় নতুন নতুন ঘটনা ঘটে চলল। একের পর এক মহাকাশচারীকে পাঠানো হতে থাকল মহাকাশে। তারা আরও বেশি বেশি সময় ধরে কক্ষপথে ঘুরতে লাগলেন। মেয়েরাও তাদের অসীম মনোবল আর সাহসের পরিচয় দিলেন। সোভিয়েত দেশের মেয়ে ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভাও মহাকাশ ঘুরে এলেন। এবার এক সময়ে দুটি মহাকাশযানে ঘুরলেন দুজন মহাকাশচারী। তারপরে পাঠান হল এক বৃহদাকার মহাকাশযান। এই যানে একই সঙ্গে তিনজন মহাকাশচারীকে পাঠান হল। আবার, মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে তাদের নির্দিষ্ট যান থেকে বাইরে একে একে ঘুরে বেড়ালেন, হেঁটে বেড়ালেন। পর পর দুটো মহাকাশযান মহাশূন্যে পাঠিয়ে জুড়ে দেওয়া হল একসঙ্গে। এমনই সব নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল মহাকাশে।

চাঁদে মানুষঃ মহাকাশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুই দেশে বেশ উৎসাহের সঙ্গে দ্রুততালে চলল তখন। আর অন্যদিকে চলল চাঁদে কিভাবে পেঁছানো যায়, চাঁদের মাটিতে মানুষ কবে কিভাবে হেঁটে বেড়াতে পারে তার তোড়জোড়। সেভিয়েট দেশের উপগ্রহ লুনা চাঁদের ছবি তুলে পাঠিয়েছে। চাঁদের যে পিঠকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, সেই পিঠেরও ছবি তুলে পাঠিয়েছে। শেষে লুনা-৯ মহাকাশযান ধীরে ধীরে নেমে এল চাঁদের পিঠে।

এদিকে আমেরিকাও বসে নেই। তারা রেনজার, সারভেয়ার, অরবিটার প্রভৃতি মহাকাশযানগুলি পাঠিয়েছে চাঁদের খোঁজ-খবর নিয়ে। অনেক খবরই সেই যানগুলি তাদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পাঠিয়েছে। আমেরিকার পাঁচটি মহাকাশযান পর পর নেমে এল চাঁদের মাটিতে মানুষকে পাঠান যায় কিভাবে তার খবর নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত দুঃসাহসিক মানুষ এই অসাধ্য সাধন করল। সেই

দিনটি হল—১৯৬৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। মার্কিন দেশের তিন দুঃসাহসিক মহাকাশচারী ঢুকে এলেন চাঁদের সীমানায়, ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লভেল এবং উইলিয়ম অ্যান্ডার্স।

চাঁদের দেশে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। বিপদ অনেক। এতদিন যারা মহাকাশে গিয়েছেন, তারা পৃথিবীর কক্ষপথেই ঘুরপাক খেয়েছেন। চাঁদে যেতে হলে পৃথিবীর টানকে কাটিয়ে চাঁদের টানের সীমানার মধ্যে যেতে হয়। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার। বিরাট দূরত্ব। এই পথ মহাযানকে রকেটের সাহায্যে অতিক্রম করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড গতিবেগ, ঘণ্টায় ৪০,৭০০ কিলোমিটার। এই প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারলে পৃথিবীর আকর্ষণকে কাটিয়ে চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়। বিষয়টা হল—পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আর চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে ঢুকতে হবে। পৃথিবীর থেকে চাঁদ আকারে ছোট, ভরও কম। চাঁদের আকর্ষণও কম। তাই পৃথিবীর আকর্ষণের এলাকা থেকে চাঁদের আকর্ষণের এলাকায় ঢুকে মাহাকাশযানের গতিবেগ অনেক কমিয়ে আনতে হবে এবং আনতে হবে খুবই দ্রুত। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গতিবেগ, গতিপথ, গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষ পথ এসবের চুলচেরা হিসাব চাই-ই চাই। একটু যদি হিসাবে এদিক-সেদিক হয় তবেই বিপদ, পৃথিবী থেকে মহাকাশযানটি যাত্রা করল চাঁদে যাবে বলে। হিসাবে একটু গোলমাল হয়ে গেল বা খুব দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত গতিবেগ কমিয়ে আনা সম্ভব হল না—ব্যাস্! চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে ঢুকতে না পেরে মহাকাশযানটি কোথায় হারিয়ে গেল সৌরমণ্ডলের মধ্যে। এ শুধু চাঁদের মাটিতে পেঁাছানোর ক্ষেত্রেই নয়, চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে গেলেও এই চুলচেরা হিসাব দরকার।

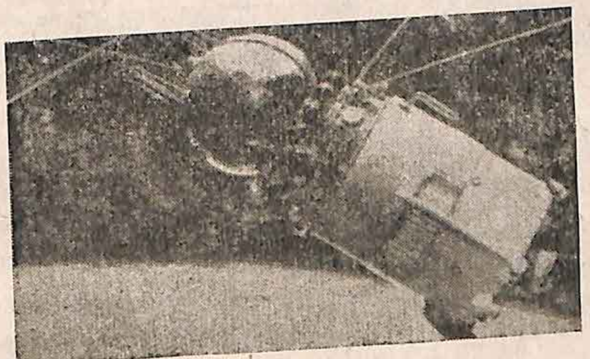
অ্যাপেলো-৮ মহাকাশযানে চড়ে তারা গিয়েছিলেন চাঁদের জগতে। এই মহাকাশযান ছিল বিরাট আকারের। স্যাটার্ন-৫ নামক বিরাট আকারের রকেটের মাথায় চেপে অ্যাপেলো-৮ মহাকাশযান যাত্রা সুরু করেছিল। এই রকেট ছিল ১০৮.৯ মিটার দৈর্ঘ্য। এর ওজন ছিল ৩,০০০ টন। এই রকেট ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। সে সময় নাকি ইংল্যাণ্ডে যত মোটর গাড়ি ছিল তাদের সব শক্তিকে একত্রিত করলে যতখানি শক্তি পাওয়া যেত, স্যাটার্ন-৫ রকেটের শক্তি ছিল তার চেয়েও বেশি। রকেট আর মহাকাশযানের সর্বমোট যন্ত্রাংশ ছিল ৭৫ লক্ষ। আর—কী সংঘাতিক কথা! এইসব মিলে ঠিক-ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক কাজও করেছিলো।

অ্যাপোলো—৮ পৃথিবী থেকে যাত্রা করার ১১ মিনিট ৫২ সেকেণ্ড পরে তার শেষ রকেটটি খসিয়ে ফেলে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করে। কক্ষপথে প্রবেশ করে দু'বার পৃথিবীকে পাক-খেয়ে ঘুরে যাত্রা করে চাঁদের দিকে। একটানা ৬৪ ঘণ্টা ধরে ছুটে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে চাঁদের আকাশে চলে এলো অ্যাপোলো—৮ মহাকাশযান। চাঁদ থেকে তার দূরত্ব তখন মাত্র ১১২ কিলোমিটার। এই ১১২ কিলোমিটার উঁচুতে থেকে তিন মহাকাশচারী তাদের মহাকাশযানে চড়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

এই প্রথম—এই প্রথম এত কাছে থেকে মানুষ দেখতে পেল চাঁদকে। না—চাঁদ মোটেই সুন্দরী নয়। কাছ-থেকে মানুষ তার নিজের চোখে দেখল, ক্যামেরার চোখে নয়। চাঁদ একঘেয়ে ধূসর বর্ণের। সর্বত্র এবড়ো-খেবড়ো, নুড়ি পাথরে ভর্তি চাঁদের পিঠ। তাতে আবার বড় বড় ফাটল, বড় বড় কতসব গর্ত আর গর্ত। এইরকম রূপ নিয়ে তো আর সুন্দরী হওয়া যায় না। এরপর তারা কুড়ি ঘণ্টা ধরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ-করে। প্রদক্ষিণ

করলেন দশবার। শেষে বিনা বাধায় ফিরে এলেন পৃথিবীর মাটিতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন চাঁদের মাটিতে নামার জন্যে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য।

আবার চাঁদের দেশে যাত্রা সুরু হল মার্কিন দেশ থেকে। মহাকাশযান অ্যাপোলো-১০-এর সঙ্গে জোড়া হল এক চন্দ্রযান। পরের বছর ১৮ই মে চন্দ্রের দিকে যাত্রা করলেন টমাস স্টাফোর্ড, জন ইয়ং এবং সারনাম। পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে চাঁদের কাছাকাছি পেঁাছে মূল মহাকাশযান থেকে চাঁদের যানটিকে আলাদা করে নিলেন চাঁদের যাত্রি সারনাম এবং স্ট্যাফোর্ড। এবার তারা নেমে এলেন চাঁদের মাটির কাছাকাছি—মাত্র পনের কিলোমিটারের মধ্যে মূল মহাকাশযানটি রয়ে গেল ওপরে। তাতে থেকে গেলেন অন্য



ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে তোলা ছবি।

মহাকাশযাত্রী জন ইয়ং। স্ট্যাফোর্ড এবং সারনাম চাঁদের পনের কিলোমিটার দূরে থেকে পরিক্রমা করতে করতে চাঁদের মাটি ভাল করে পরীক্ষা করলেন। ভবিষ্যতে সেখানে যে চন্দ্রযান নিয়ে মানুষ নামবে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? তাইতো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা। কাজ শেষ করে তাঁরা আবার চন্দ্র যানটিকে জুড়ে দিলেন মূল মহাকাশযানের সঙ্গে। নিরাপদে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তারা ফিরে এলেন পৃথিবীতে।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। মানুষ কত শত যুগ ধরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে—কী আছে ওখানে? জানতে হবে, দেখতে হবে। মানুষের শত শত বছরের এই স্বপ্ন সফল হল সেদিন। সেদিনটি হল—১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই। মহাকাশযাত্রী আরমস্ট্রং, অলড্রিন এবং কলিনস্ মহাকাশযান অ্যাপোলো—১১ চেপে যাত্রা করলেন চাঁদে। চাঁদে তারা নিরাপদে পেঁাছে গেলেন। পৃথিবীর মানুষ দেখল আরমস্ট্রং এবং অলড্রিন চন্দ্রযানটিকে খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদের মাটিতে নেমে এলেন। প্রাণহীণ, বায়ুহীন কঠিন চাঁদের মাটি। চাঁদের মাটিতে প্রথমে পা রেখেছিল নীল আরমষ্ট্রং তারপরে অলডরিন তখন গ্রীনউইচ সময় ছিল—৯টা বেজে ১৫ মিনিট। দু'ঘণ্টা ধরে চাঁদের দেশে এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ঝোলাভর্তি চাঁদের মাটি নিয়ে তারা ঢুকে গিয়েছিলেন চন্দ্রযানে। তারপর চন্দ্রযানকে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এরপর ফিরে এলেন পৃথিবীতে।

মানুষের কী অসাধারণ শক্তি এবং সৃষ্টির উৎসাহ! মানুষ কী অভ্রান্ত হিসাব কষে অসীম শক্তিধর হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলে চাঁদের দেশে গিয়ে চাঁদের মাটি ঝোলায় ভর্তি করে নিয়ে ফিরে এলো—ভাবতেও অবাক লাগে। এই বিশাল জয় কোন বিশেষ মহাকাশ যাত্রীর জয় নয়, কোন বিশেষ দেশের জয় নয়—এই জয়—মানব শক্তির জয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেস—স্টেশন

সোভিয়েত, আমেরিকা এই দুটি দেশ বেশ কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে পৃথিবীর কক্ষে। তারা নিজেরাই সব পাক খেয়ে খেয়ে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ঘুরে চলেছে। ভারতেরও পাঠান উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে রয়েছে। জাপান দেশের বিজ্ঞানীরা

কয়েকটি পাঠিয়েছেন। এখনও বহু দেশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর কাজ চলছে।

এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে অনন্ত-কাল ধরে ঘুরে চলেছে। এদের কক্ষেপথে স্থাপন করার জন্যে এমন একটি গতিবেগ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে পৃথিবী থেকে দেখে মনে হবে চিরকাল একই জায়গায় রয়েছে। পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খায়। পৃথিবী থেকে ৩৫,২০০ কিলোমিটার দূরের কোন বস্তু পৃথিবীকে একবার পাক খেতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। এই প্রকার হিসাব করে এইসব কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেস-স্টেশন পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। আর—এগুলি হাজারে হাজারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যকে ঘিরে যেমন গ্রহগুলি আর গ্রহদের ঘিরে যেমন উপগ্রহগুলি পাক খেয়ে চলেছে, এগুলিও ঠিক তেমনি পৃথিবীকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে।

এইসব কৃত্রিম উপগ্রহের একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে অক্ষ-আবর্তন করে চলেছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে। কৃত্রিম উপগ্রহও ঠিক তেমনি কোথায়, কতটা দূরে স্থাপন করা হবে তা আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া হয়। কারণ কৃত্রিম উপগ্রহকে বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্যে পৃথিবীর কক্ষে পাঠান হয়। সুতরাং কোথায় কত দূরে থেকে ঘুরে চলতে চলতে পৃথিবীর কোন অংশ দেখতে—এসব প্রশ্ন থাকে তো। সেই জন্যেই পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতা প্রয়োজন হয়, নইলে যে কাজটির জন্য পাঠান তাই তো হবে না।

পৃথিবীর সবদেশের মানুষ স্পেস—স্টেশনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ-এর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ সুন্দর ভাবে সমাধা করা হয়ে চলেছে। মহাকাশে থেকে পৃথিবী সম্পর্কে

অনেক-অনেক বেশি খবর এই কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ আমরা জেনে থাকি।

আমরা তো পৃথিবীর মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পারি না। আকাশের কয়েক কিলোমিটার বিমানে করে উঠে গেলেও না। আর যদি স্পেস-স্টেশন বা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে দেখা যায়, তবে অনেক কিছুই একই সঙ্গে দেখা যায়। পৃথিবীর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠের অনেক কিছুই। পৃথিবীর অরণ্যে কোথাও আগুন লেগেছে কিনা, কোন পর্বতে ধস নামছে কিনা, কোথায় কোন্ নদীর অবস্থা ভাল নয়, মাটির নিচে কোথাও কোন খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে কিনা—সবই জানা যায় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।



(ওপরে) গ্রহ পৃথিবী, ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে অ্যাপোলো-১৭ থেকে তোলা ছবি। পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ, বিশেষ করে দক্ষিণ গোলার্ধ মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু উত্তরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আরব ও লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, আফ্রিকার শৃঙ্গ ও মাদাগাস্কার বা মালাগাসি।

সমুদ্রের জলের তলায় লুকিয়ে আছে অগাধ সম্পদ। আমরা তার বিশেষ কোন সন্ধান জানি না। এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারলে মানুষের খুব উপকার হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে

শুধুমাত্র ভূ-পৃষ্ঠ নয় বা মাটির গভীরে খনিজ পদার্থের খোঁজ-খবর নেওয়াই নয়—সমুদ্র-সম্পদেরও সন্ধান করা চলেছে।

স্পেস-স্টেশন থেকে গোটা পৃথিবীকে এক সঙ্গে দেখা যায়। এই প্রকার দেখা যায় বলেই পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে কোথায় কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে—ঝড় উঠবে কিনা, বৃষ্টি হবে কি না, কোথায় কি রকম মেঘ জড়ো হয়ে রয়েছে—তাতে করে ঘূর্ণিঝড় হবে কিনা, হলেও কোথায় কোথায় তা হতে পারে—এইসব খবর আমরা স্পেস-স্টেশন মারফৎ অনেক আগে থেকেই জানতে পারি।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ ইত্যাদি বাদ দিয়েও খবরা-খবর আদান প্রদান অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই স্পেস-স্টেশন মারফৎ হয়ে চলেছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ঘটে চলা কোন ঘটনা আমরা দেখতে পারি দূরদর্শনের পর্দায় এই স্পেস-স্টেশনের সাহায্য নিয়ে।

এছাড়া ভবিষ্যতে জীববিজ্ঞানীদের গবেষণার বহুকাজে লাগবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ। যেহেতু কৃত্রিম উপগ্রহে কোন ওজন থাকে না, তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বলে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিয়ে সমরবিদরা বহু কাজ করে চলেছেন। অন্য দেশের বিভিন্ন কাজ কর্মের খোঁজ নিতে পারলে নিজের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বেশ দৃঢ় করা যায়। এই কাজে সহায়ক হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।

এছাড়া আর একটি মস্ত কাজ হয় স্পেস-স্টেশন থেকে। যেহেতু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে অনেক ধূলিকণা এবং অন্যান্য পদার্থের কণা, তাই অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র এদের বিষয়ে গবেষণা করতে বা এদের পর্যবেক্ষণ করতে হলে যতটা সুবিধে পৃথিবী থেকে, তার চেয়ে বেশি সুবিধে হল স্পেস-থেকে।

তবে—এত কিছু কাজের সহায়তায় জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর নানা দেশে কাজে লাগান হচ্ছে। ভারতেরও বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ আছে। ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-কে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

মহাকাশে থাকতে হলে

মহাকাশে থাকতে হলে বিশেষ কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। মানুষকে পৃথিবীতে খাদ্য খেতে হয়, অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। প্রচুর পরিমানে জল প্রয়োজন হয়। এছাড়া রয়েছে অন্য আর একটি অবস্থা—সে অবস্থা হল পৃথিবীর মাটিতে মানুষের দেহের ওজন থাকে, সব বস্তুরই ওজন থাকে; কিন্তু মহাশূন্যে গ্রহের কক্ষে ঘুরে বেড়াতে গেলে ওজন থাকে না। তাহলে এই সমস্যাগুলির নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে।

সোভিয়েত আর আমেরিকার বহু নভশ্চর মহাকাশে বহু দিন কাটিয়ে এসেছেন। আমেরিকার তিনজন নভশ্চর স্কাইলাব মহাকাশযানে কাটিয়েছেন ৮৪ দিন। সোভিয়েতের মহাকাশযান সালিয়ুৎ-৬-এ দুইজন কাটিয়েছেন ১৮৫ দিন। আরও দুইজন সোভিয়েতের নভশ্চর সালিয়ুৎ—৭ স্পেস-স্টেশনে কাটিয়েছেন ২১১ দিন। এ-এক বিরাট সময়। কি করে তাদের প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কাজ চলত? ভারহীন অবস্থায় তারাতো সেখানে ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। শরীরের ওজন তাদের একটু কমেনি। সুস্থ শরীরেই স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছেন। আর একটি মজার খবর হল—সালিয়ুৎ—৪-র নভশ্চরেরা স্পেস-স্টেশনের মধ্যে ছোলা গাছের চাষ করে সেই গাছে জন্মানো ছোলা খেয়েই

জন্মদিনের উৎসব পালন করেছেন, পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে। এও সম্ভব হয়েছে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে। যারা মহাকাশে দিন-রাত কাটিয়েছেন।

তারা পৃথিবী থেকেই নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে সে সব খাদ্যের বেশ কিছু রকম-ফের আছে। ওজন যত কমানো যায় ততই যে ভাল।



চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন নভচারী ইরভিন—লুনার ইলেক্‌ট্রোমোবাইলের পাশে দাঁড়িয়ে

পৃথিবীতে বসে আমরা পৃথিবী থেকেই খাদ্য পেয়ে থাকি। পৃথিবী সূর্য থেকে শক্তি পায়। আর, জীবন্ত প্রাণীরা ব্যবহার করে পৃথিবীর বাতাস-মাটি-জল। এইসব বস্তুর পরমাণু পৃথিবীতে শেষ হয়ে যায় না।

এই সালোকসংশ্লেষের ফলে পৃথিবীর ভাণ্ডার হল শেষহীন। এই যেমন—আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড বের করে দিয়ে থাকি। উদ্ভিদ্‌ আবার সূর্যের আলোর সাহায্যে এই কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্রহণ

করে তার কায়দেহ গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ার নাম সালোকসংশ্লেষ। এই উদ্ভিদ বড় হয়। গোরু-ছাগল, জন্তু-জানোয়ারেরা এবং আমরা মানুষেরা উদ্ভিদ খাই। এইভাবে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল, মাটির নীচের কিছু গভীরতা এবং সমুদ্রজলের নীচের কিছু গভীরতা নিয়ে এক জীব চক্র গড়ে উঠেছে। এই হল জীবন মণ্ডল। এর শেষ নেই। যতদিন সূর্যের আলো আছে পৃথিবীতে মাটি-জল আছে, ততদিন থাকবে।' তাই পৃথিবীর মাটির ওপরে স্বাভাবিক ভাবেই খাদ্যের ভাণ্ডার থেকে যাবে।

কিন্তু, মহাকাশ যানের ভিতরে এসব উপাদানগুলি তো নেই। আর তা রাখা সম্ভবও নয়। তাই পৃথিবী থেকে নিয়ে আসা খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের ওপর নির্ভর করতে হয় নভশ্চরদের।

খাদ্য ঃ একজন মহাকাশচারীর দৈনিক কতটা খাদ্য প্রয়োজন হতে পারে। তাঁকে তো বেঁচে থাকতে হবে, সুস্থ শরীরে স্বাভাবিকভাবে সব কাজ শেষ করে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসতে হবে। মহাকাশযানে তো একজনের দৈনিক যা খাদ্য প্রয়োজন তা তৈরী করা সম্ভব নয়। একজন মানুষের দৈনিক ৬০৩ গ্রাম শুকনো খাবার প্রয়োজন। এই পরিমাণ শুকনো খাদ্য তৈরি করতে অত্যন্ত সুফলা জমির প্রয়োজন হয় ৩০ বর্গমিটার। তবেই তো দেখা যাচ্ছে এ-এক অসম্ভব ব্যাপার। এ ধরণের খাদ্য তৈরি করা মহাকাশযানের মধ্যে সম্ভব নয়। তাই মহাকাশচারীর খাদ্য বাইরে থেকেই নিয়ে যেতে হয়। তবে খাদ্যের এই হিসাবটা করা হয় ক্যালরির পরিমাণ দিয়ে। একজন লোকের দৈনিক প্রয়োজন হয় ৩১০০ থেকে ৩২০০ ক্যালরি পর্যন্ত মহাকাশচারীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যভাণ্ডারের জন্য স্থায়ী স্পেস-স্টেশন খুবই কাজে লাগবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

জল ঃ মানুষকে বাঁচতে হলে জল চাই-ই চাই। শুধু মানুষ কেন প্রাণী জগতের সবারই জল প্রয়োজন। এখন মহাকাশে জল

নিয়ে যেতে হলে খরচ অনেক। জলের ওজনও তো বেশ। তাই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই জলের সমস্যা সমাধনের জন্যে।

একজন মানুষের গড়ে প্রতিদিন প্রয়োজন হয় সাড়ে আট কেজি জল। অমরা এই সাড়ে আট কেজি জলই প্রস্রাব, নিশ্বাস এবং ঘামের সঙ্গে বর্জন করে থাকি। শুধু পানীয়ই নয় অন্যান্য কাজেও আমাদের জলের প্রয়োজন।

এখন, এই জলের খরচ কমানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। নইলে মহাকাশযানে এত জল, আসবে কোথা থেকে? আমরা যে জল বর্জন করি সেই জল পরিশোধন করে করে ব্যবহার করা চলে। মহাকাশযানেও এই বর্জিত জল পরিশোধন করার ব্যবস্থা হয়েছে! তবে, অ্যাপোলো মহাকাশযানের যাত্রীদের জন্য দৈনিক সাড়ে তিন কিলোগ্রাম পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বর্জিত জল পরিশোধন করে বার বার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়টা হল একই জল বার বার ব্যবহার করা। এই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় রুদ্ধ-ব্যবস্থা। আবার এর সঙ্গে ছিল উন্মুক্ত ব্যবস্থাও। উন্মুক্ত ব্যবস্থা হল—বর্জিত জল পরিশোধন না করে তাকে একেবারেই বর্জন করা। নভশ্চরেরা শূন্যেই প্রস্রাব করেছিলেন। সেই প্রস্রাব সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডায় জমাট বেঁধে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়ে কোথায় চলে যায়। কঠিন পদার্থ শূন্যে ফেলার বেশ বিপদ আছে। তা মহাকাশযানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে থাকবে। সেজন্যে ব্যোমযান চালানোর সময় দেখতে অসুবিধা হবে মহাকাশচারীদের। তাই নভশ্চরেরা মলত্যাগ করেছেন প্লাস্টিকের থলিতে। সেই থলি জীবাণু-নাশক ও দুর্গন্ধ নাশক পদার্থ দিয়ে প্লাস্টিকের থলি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। বর্জিত পদার্থের মধ্য থেকে যায় ঘাম এবং নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা জলকণা। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যোমযানের আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ

করা হয়। আর বাকি যা থাকে তা ঠাণ্ডা ধাতুর পাতের ওপর ঘনীভূত করার ব্যবস্থা থাকে।

অক্‌সিজেন ঃ মানুষের প্রতিদিন অক্‌সিজেন প্রয়োজন হয় নয়শ' গ্রাম। আর, মানুষ প্রতিদিন এক কেজি, দুইশ' গ্রাম, কার্বন ডাই-অক্‌সাইড ত্যাগ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় অক্‌সিজেনের যোগান যদি ব্যোমযানে না থাকে তবে মানুগের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

কয়েকটি ব্যোমযানে প্রয়োজনীয় অক্‌সিজেন পৃথিবী থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ব্যোমযানের মধ্যেও বায়ুমণ্ডল থাকে। তাতে অক্‌সিজেনের যোগান ঠিক রাখতে হয়। অতিরিক্ত কার্বন-ডাই অক্‌সাইড বের করে দিতে হয়। নইলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্‌সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে শ্বাস-কষ্টে ভুগতে হবে মহাকাশচারীদের।

ব্যোমযানের মধ্যেকার বায়ুমণ্ডল ঠিক ঠিক রাখা এক জটিল ব্যাপার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এক স্বাভাবিক চাপ আছে। কিন্তু ব্যোমযানের ক্ষেত্রে তা নেই। আর যদি তাপমাত্রার এদিক-সেদিক হয়, তবে ব্যোমযানে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। ব্যোম-যানের মধ্যের চাপ আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ এক নয়। তাই বায়ুচাপ কম হলে শ্বাস কস্ট হয় প্রচণ্ড। তখন প্রয়োজন হয় বিশুদ্ধ অকিসিজিনের। যেমন—হিমালয়ের চূড়ায় বায়ুচাপ কম। এজন্যে সেখানে আরোহণকারীদের নিয়ে যেতে হয় অক্‌সিজেন। অ্যাপোলো ব্যোমযানের ভিতরে ছিল বিশুদ্ধ অক্‌সিজেন। বিশুদ্ধ অক্‌সিজেনও আবার খুব বিপদ। একটু এদিক-সেদিক হলে যে কোন সময়ে আগুন ধরে বিপদ ঘটে যেতে পারে। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের ২৭ শে জানুয়ারী। অ্যাপোলো—১ ব্যোমযানের প্রশিক্ষণ চলছিল তখন। বৈদ্যুতিক গোলযোগে ব্যোমযানের ভিতরে আগুন ধরে যায়। তাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনজন প্রশিক্ষণ রত মহাকাশচারী।

তাপমাত্রা ঠিক রাখা ঃ ব্যোমযান ছুটে চলে মহাকাশের পথে। মহাকাশে কোন তাপ নেই। কিন্তু তাপ না হলে তো আর চলে না। মহাকাশের বুকে ব্যোমযানে তাপ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে। আর মহাকাশ-চারীদের শরীরেও তাপ উৎপন্ন হয়। মহাকাশে তাপ নেই বলে মহাকাশে ছুটে চলা ব্যোমযানের তাপ চলে যেতে থাকে তাপহীনতার মধ্যে। কারণ, তাপ ওয়ালা কোন বস্তু তাপহীনতার কাছে এলে তাপ চলে যায় তাপহীনতার মধ্যে। এজন্যে ব্যোমযানের বাইরের দিকে একপ্রকার তরল পদার্থ সঞ্চালিত করা হয়। তাতে ভিতরের তাপ যায় কমে। বাইরের দিকে অতিরিক্ত তাপ চলে যায় মহাশূন্যে।

পোশাক ঃ পৃথিবীতে যে পোশাক আমরা ব্যবহার করি মহাকাশে সেই পোশাক একদম অচল। মহাকাশচারীদের পোশাকের নাম হল স্পেস-স্যুট বা মহাশূন্যের পোশাক। এই পোশাক দেখতে যেমনি, তেমনি পরে থাকতেও ঝামেলা। ব্যোমযান থেকে বাইরে এলেই এই পোশাক চাপিয়ে আসতে হয়, নইলে বিপদ। তবে এটা খুলে রাখা চলে ব্যোমযানের মধ্যে। ব্যোমযানের ভিতরেও অনেক সময় পরে থাকতে হয়।

মহাশূন্যের পোশাক কেমন বেঢপ। মাথায় থাকে আবার মুখ-ঢাকা টুপি। এই পোশাকের ভিতরে ঢুকে মানুষ যাতে বসবাস করতে পারে তেমনি ভাবেই তৈরি করা হয়। এর ভিতরে থাকে নিয়ন্ত্রিত বায়ুমণ্ডল, তাপমাত্রা এবং আদ্রতা! সঠিক পরিমাণ অক্‌সিজেন আর কার্বন ডাই-অক্‌সাইডেরও ব্যবস্থা থাকে।

তবে, খাদ্য গ্রহণের সময় এই পোশাক খুলে রাখা চলে। খুলে না রাখলেও চলে। মলত্যাগও প্রস্রাব করার ব্যবস্থা এই পোশাকের মধ্যেই থাকে।

ওপরে ওঠা ও নামার সময়ের বেগ

যারা বিমানে চড়েছে বা নাগর-দোলায় চড়েছে তারা জানে ওপরে ওঠার ও ওপর থেকে নামার সময় শরীরের ভিতরে কেমন-একটা ভাব হয়। ব্যোমযান যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন তার গতিবেগ প্রচণ্ড। নেমে আসার সময় এই গতিবেগ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়। এই বেগ কমা বারা সহ্য করার একটা সীমা থাকে মানুষের। এই সীমার বাইরে গেলে খুবই অসুবিধে।

ব্যোমযান যখন অতিবেগে মহাকাশের দিকে ছোটে তখন মহাকাশচারীর শরীরে প্রচণ্ড এক চাপ কাজ করে। এই চাপ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে মহাকাশ যানের গতিমুখ সমকোণে থাকলে এই চাপের শক্তিকে মানুষ সহ্য করতে পারে। তাই, মহাকাশ যান যখন ওপর দিকে দুরন্ত গতিতে উঠতে থাকে, তখন মহাকাশচারীরা কৌচের ওপর আড়াআড়ি ভাবে নিজেদের দেহ ফিতে দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখে।

দুরন্ত গতিতে উঠে যাওয়ার ফলে যে শক্তির চাপ সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে মহাকাশচারীরা এইভাবে উদ্ধার পেয়ে থাকে।

ভারশূন্য অবস্থায়ঃ মহাকাশচারীদের মত হল, ভারশূন্য অবস্থায় থাকাটা বেশ মজার। এতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। শুধু খেতে-শুতে একটু যা অসুবিধে। অত্যধিক শক্তি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও ভারহীনতা ক্ষতিকর নয়।

ভারহীন অবস্থায় হাঁটা-চলায় বিশেষ অসুবিধা হয়নি দেখা গেছে। তবে—কিছু খেতে গেলে, কিছু নাড়াচাড়া করতে গেলেই খুব ঝামেলা। এ-ঝামেলা বেশ মজার। বস্তুটি যে কোন দিকে ছুটতে সুরু করে একটু ছোঁয়া লাগলেই। এই জন্যে ব্যোমযানে বসে এইসব কাজের জন্যে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। তবে, ভারহীন অবস্থায় শরীর বেশ ভালই থাকে। মানুষের

শরীরও এমন যে, একটু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে বা সচেষ্ট হলে বিভিন্ন অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

মহাকাশের বিপদ ঃ মহাকাশে সবচেয়ে ভয়ের আর বিপদের বিষয়টি হল—মহাজাগতিক বিকিরণ। এই বিকিরণ চোখে দেখা যায় না। আমাদের সূর্য হল সব চেয়ে কাছের নক্ষত্র। যে গ্যালাক-সিতে আমাদের অবস্থান তাতে রয়েছে অসংখ্য এমনি নক্ষত্র। আরও অন্য সব গ্যালাকসিও তো রয়েছে। এইসব হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জ্যোতিষ্ক থেকে আলোর গতিতে ভেসে আসছে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বিভিন্ন কণিকার স্রোত। একেই বলে মহাজাগতিক বিকিরণ। এই বিকিরণ হল প্রাণঘাতি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে আমরা বেঁচে আছি। বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরকে ভেদ করে মহাজাগতিক শক্তিকণিকা মাটিতে এসে পেঁছতে পারে না। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রও এইসব বিকিরণের কণিকা-গুলি সরিয়ে রাখে। আকাশে স্পুটনিক পাঠানোর আগেই এইসব খবরা খবর সংগ্রহ করা হয়েছিল।

মহাকাশযানকে যেখানে পেঁছাতে হয়, সেখানে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল নেই, চৌম্বক ক্ষেত্রও নেই। তাই, মহাকাশচারীদের বিশেষ সাবধানে থাকতে হয়। এমনকি মহাকাশযানে এইসব কণিকার ছোঁয়া যখন লাগে, তখন তার ছোঁয়াচ মানুষের শরীরে লাগলেও বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

মহাকাশে উল্কা পিণ্ড ব্যোমযানের কাছে আর এক বিপদ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে উল্কা পিণ্ডের ভয়টা কম। কিন্তু, মহাকাশে বায়ুমণ্ডল না থাকায় ধূলিকণা থেকে শুরু করে বহু বড় বড় বস্তু পিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে এলেই এদের বলা হয় উল্কা। এইসব বড় বড় উল্কার সঙ্গে মহাকাশযানের ধাক্কা লাগতে পারে, সংঘর্ষ ঘটতে পারে। ছোট-

খাটো সংঘর্ষ রোধ করার ব্যবস্থা থাকে ব্যোমযানে। কিন্তু, বড় সংঘর্ষ কিছু ঘটলে বিপর্যয় কিছু ঘটা অস্বাভাবিক কিছু না।

ব্যোমযান যখন নেমে আসতে থাকে অথবা উঠতে থাকে, তখন যদি বায়ুমণ্ডলের ওপর দিকে পারমাণবিক পরীক্ষা কাজ চালান হয় তবে মহাকাশ যাত্রীদের বিপদ ঘটে থাকে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ মহাকাশ নিয়ে গবেষণারত দেশগুলি এইসব বিপদ-আপদের কথা ভেবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং আরও ১৭টি দেশের মধ্যে ১৯৬৮ সালের ২২শে এপ্রিল এই সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে এই সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

মহাকাশে অনেক বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। এর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক দেশকে সাহায্য করতে পারে। তাই এই চুক্তিতে—যে কোন জরুরী অবস্থায়, যে কোন বিপদে-আপদে, কোন দুর্ঘটনা, অনিচ্ছাকৃতভাবে মহাকাশচারীদের নেমে আসতে হলে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সহ মহাকাশ-বিষয় সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা এই চুক্তিতে নেই বলা হয়েছে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত সে সব আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ঘটনা ঘটে গেছে তা বর্তমান বিশ্বে বেশ উল্লেখযোগ্য।

শুধুমাত্র গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়

চাঁদ আমাদের খুবই কাছে—মোটামুটি চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে। চাঁদে একের পর এক অভিযান হয়ে গেছে। সোভিয়েতের 'লুনা'-র মত ব্যোমযানগুলি হয়ত চাঁদে অভিযান চালাবে। এখন তো আরও শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তিতে পরিচালিত রকেটের যুগ। এখন মানুষের লক্ষ্য উপগ্রহ নয়—অন্যান্য গ্রহ। চাঁদ হবে মধ্যবর্তী একটা স্টেশন—স্পেস-স্টেশন।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে এই মহাকাশ গবেষণার যুগ সুরু হয়েছে। তাই প্রথম উপগ্রহ সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পাঠান স্পুটনিক—১ এই মহাকাশ গবেষণার যুগের প্রতীক বলা চলে।

চাঁদে ব্যোমযান পাঠান এখন আর কোন শক্ত কাজ নয়। শক্ত কাজ হল অন্যান্য গ্রহে পাঠানো। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় চাঁদ তো খুবই কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের তুলনায় একশ গুণেরও বেশি। দূরত্ব বাদ দিলেও অন্য একটি অসুবিধা হল—চাঁদ পাক খায় পৃথিবীকে বেড় দিয়ে। কিন্তু অন্যান্যগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না—ঘোরে সূর্যের চার-দিকে। আমাদের এই সব কথা মনে রাখতে হবে।

এখন পৃথিবীতে যে সব ব্যোমযান আছে তাতে করে পৃথিবী থেকে সরাসরি অন্য গ্রহে মানুষ পাঠানো সম্ভব নয়। ব্যোমযানকে যাত্রা করতে হয় খুব সতর্কভাবে। রকেট তাকে ঠেলে পৃথিবীর বাঁধনটাকে কাটিয়ে দেয়, আর একট ছুট দিয়ে দেয়। আবার, যদি দেখা যায় কক্ষে পৃথিবীর ছুটের চেয়ে ব্যোমযানের ছুট বেশি হয়ে গেল তবে সেই গ্রহে আর ব্যোমযান পৌঁছাবে না, অন্য কোথাও চলে যাবে। আর ছুট যদি কম হয় তবে ভিতরের গ্রহের দিকে থেকে যাবে। এইসব লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। বিভিন্ন গ্রহের বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বহু ব্যোমযান সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলিতে পাঠিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে, ছবি তুলে পাঠিয়েছে। এমনকি অনেক গ্রহে খুব ধীরে ধীরে নামতেও সক্ষম হয়েছে।

১৯৬০ সালে শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পায়োনিয়ার ব্যোমযানের উৎক্ষেপণ থেকে এই অভিযান সুরু হয়েছে। এযে অনেক দিনের কথা হয় গেল। এর পর সোভিয়েতও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশ ও বহু অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠিয়েছে অন্যান্য গ্রহে। অন্যান্য গ্রহগুলির বিষয়ে আমরা

বিস্তারিতভাবে এই সব অনুসন্ধানী ব্যোমযানের মারফৎ অনেক তথ্য জেনেছি।

এখন মানুষের জানার ইচ্ছা শুধুমাত্র সৌরমণ্ডল নয়—সৌর-মণ্ডলের বাইরেও। ১৯৭৩ সালেই সৌরমণ্ডলকে অতিক্রম করে চলে গেছে পায়োনিয়ার—১০ ব্যোমযান।

কিন্তু, এসব গ্রহে মানুষ পাঠাতে হলে প্রচুর সময় লাগবে। এদের দূরত্ব যে অনেক। মানুষের এত আয়ু কোথায়। এখন তো শুধু আমরা সৌরমণ্ডলের গ্রহ, সূর্য ও অন্যান্য তারার খোঁজ-খবর নিচ্ছি। অনুসন্ধানী ব্যোমযানগুলি খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোথায় কী আছে। ধূমকেতুর পথেও অনুসন্ধানী রকেট যাত্রা করেছে। কেন আমরা এই রকেটের সাহায্যে অন্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব নয় বলছি—তার কারণ হল দূরত্ব। অনুসন্ধানী ব্যোমযান-গুলি যে গতিতে পাঠান হয়, সেভাবে মানুষকে পাঠান সম্ভব হয়নি। তবে বিজ্ঞানীদের আশা আছে, ভবিষ্যতে হবে। চাঁদকে তখন স্পেস-স্টেশন করলেও চলবে। শুধুমাত্র অন্য গ্রহ নয়—একদিন হয়ত মানুষ অন্য তারার জগতে গিয়েও হাজির হতে পারে। যেখানে হয়ত আমাদের মত অন্য কোন প্রাণী থাকলে থাকতেও পারে। এসব ব্যাপারে এসব ভবিষ্যৎবাণী বেশ কৌতুহল জাগায়। তবে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তো সবে সেই দিনের, মাত্র তিনশ বছরের বলা চলে—নিউটনের সময় থেকেই তো। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তিন-চারশ' বছর কতটুকুই বা। মানুষের তো জানার শেষ নেই। আজ যা জানি না, কাল হয়ত জানব। আজ আমি যা জানি না, তুমি পরে তা জানবে। এমনিই হয়ে থাকে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে। তাই মহাকাশ বিষয়ে মানুষের জানার সীমা যেভাবে দিনকে দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে তাতে একদিন সে অন্য গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হবেই। সেখান থেকে অন্য তারার জগতে কি আছে তাও জানতে পারবে। আজ যা সম্ভব নয়, আগামীকাল তা সম্ভব হবেই।

পঞ্চম পর্ব

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

আমাদের দেশে মহাকাশ গবেষণা সুরু করা হয় ১৯৬১ সাল থেকে। আমাদের দেশে পারমাণবিক শক্তি বিভাগ আছে। মহাকাশ-গবেষণাগার বিষয়ে যা কিছু দায়-দায়িত্ব তাদের হাতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পরের বছর ১৯৬২ সালে এই বিভাগ একটি মহাকাশ-গবেষণা কমিটি গঠন করে। এই কমিটির ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এর নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ বিক্রম সারাভাই।

তবে, ১৯৫৭ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠায়, ঠিক তখনই নৈনিতালে যে মানমন্দির আছে সেখানে একটি স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল উপগ্রহটির ওপরে নজর রাখার জন্যে। এর ঠিক পাঁচ বছর পরেই ডঃ বিক্রম সারাভাই-র নেতৃত্বে ভারতে মহাশূন্য গবেষণার সূত্রপাত হয়। সে সময় ডঃ সারাভাই লিখেছিলেন,—তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের দেশের মানুষ ও সমাজ সেবায় অগ্রগামী প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা কারো চেয়ে পিছনে পড়ে থাকবো না।

বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সারাভাই ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণার কাজে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রবর্তক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এমন কিছু কিছু যন্ত্রবিদ এবং নিজের কিছু ছবি নিয়ে তিনি এই কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, যে ১৯৭৪ সালে ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি উপগ্রহকে আকাশে পাঠানো হবে। এই পাঠানোর ব্যবস্থাও থাকবে একদম

নিজস্ব। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি দেশের ক্ষেত্রে ও বিদেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্যে। এর পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। আমাদের দেশ তা সানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডঃ সারাভাই সবকিছু দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এদিকে, ত্রিবান্দ্রমের কাছে থুম্বা নামে একটা জায়গা কাছে। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সাহায্যে এক রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। পরে ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে এই থুম্বা উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পায়। এর পর স্থাপিত হয় ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন,—ইসরো বা ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র। এই সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে। এই সংস্থাটি স্থাপিত হয় ভারতীয় পারমাণবিক সংস্থার অধীনে। এই সংস্থার অধীনে অন্ধ্র প্রদেশের হরিকোটার বারো হাজার হেক্টর জমির ওপরে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ একটি উৎক্ষেপণ মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে।

এর পরে আবার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে, বাঙ্গালোরে। নাম দেওয়া হয়—ইণ্ডিয়ান সায়েণ্টিফিক স্যাটেলাইট প্রোজেক্ট, সংক্ষেপে হ'ল আই. এস. এস-পি। বাংলায় হ'ল—ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ প্রকল্প।

ভারতের প্রথম উপগ্রহ—আর্যভট্ট ঃ এতদিন তো অনেক প্রকল্পই হল সংস্থাও হল—এবার নির্মাণ করতে হবে উপগ্রহ। এই সংস্থাকে উপগ্রহ তৈরির জন্য দু'বছর সময় দেওয়া হল। তবে উপগ্রহ তৈরি করতে সময় লাগল আড়াই বছর। এবার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানোর জন্যে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। ১৯৭৫ সালের ১৯শে

এপ্রিল এই উপগ্রহটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হয়। এর জন্যে মোট খরচ হয়—চার কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। এই উপগ্রহটির নামকরণ করা হয় প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টের নামে।

ভারতের অন্যান্য উপগ্রহ ঃ ১৯৭৪ সালে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য রেখে উপগ্রহ নিয়ে ভারতে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়—স্যাটেলাইট ইন্‌স্ট্রাক্‌সনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেণ্ট, সংক্ষেপে হ'ল—'সাইট'। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামূলক প্রচার। তাই বাংলায় বলা যায়—শিক্ষামূলক উপগ্রহ টেলিভিশন পরীক্ষাকার্য।

আমেরিকায় 'ন্যাসা' নামে' একটি সংস্থা আছে। এদের ওপর সে দেশের দায়িত্ব দেওয়া আছে—মহাকাশ বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের। এই 'ন্যাসা' সংস্থার সহযোগিতায় ভারতের 'সাইট' পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, ভারতের পাঁচ হাজার গ্রামে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষামূলক দূরদর্শন অনুষ্ঠান প্রচারের কথা ছিল। এই পরিকল্পনাটা কেমন ছিল দেখা যাক না কেন।

আমেরিকায় 'কেনেডি স্পেস কেন্দ্র' নামে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আছে। ১৯৭৪ সালে সেই কেন্দ্র থেকে একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠান হয়। এই একটিমাত্র উপগ্রহকে আকাশে তুলতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ হয় আমেরিকার। আমাদের দেশের টাকার হিসাবে তখন খরচ হয়েছিল দেড়শ' কোটি টাকারও বেশি। অ্যাপোলোর সাহায্যে চাঁদে মানুষ পাঠাতে আমেরিকার এর অর্ধেক টাকাও খরচ হয়নি। এখন—এই উপগ্রহটি ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গলোপাগোস দ্বীপের আকাশে অবস্থান করেছিল। সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব এলাকাই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে প্রচারিত দূরদর্শনের

কর্মসূচী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অঞ্চলেই ধরা যেত। এর পরে সেই বছরেই এই উপগ্রহটিকে সরিয়ে এনে স্থাপন করা হয় ভারত মহাসাগরের আকাশে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৬,০৫ কিলোমিটার উঁচুতে এটিকে স্থাপন করা হয়েছিল। এই জায়গায় অবস্থানরত থেকে গোটা ভারত নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে নজরে রাখা যায়। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক প্রচারের জন্য এই উপগ্রহটিকে এক বছর ব্যবহার করা হয়েছিল।

ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ—ভাস্কর ঃ ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্ট-কে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মহাকাশে তোলা হয় ১৯৫৭ সালের ১৯শে এপ্রিল। এর পর দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সহাযাগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি দ্বিতীয় উপগ্রহ—ভাস্কর-১-কে মহাকাশে তোলা হয়। আমাদের দেশের মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির চুক্তি হয়েছিল এই উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ বিষয়ে।

ভাস্কর হলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তারই নামে নামকরণ করা হয় ভারতীয় দ্বিতীয় উপগ্রহটির।

ভাস্কর-১ উপগ্রটির কাজ হল পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা। ইংরাজীতে বলে—'স্যাটেলাইট ফর আর্থ অবজারভেশন', সংক্ষেপে এস. ই. ও। উপগ্রহটির কাজ যেহেতু পর্যবেক্ষণ করা, তাই পর্যবেক্ষণ করে ভারতের ভূভাগ, অরণ্য, জল, সমুদ্র, আবহাওয়া—এইসব। কাজগুলি খুব সহজ নয়।

মানুষের চোখের দৃষ্টি খুব বেশি দূর যায় না। কিন্তু সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত দেখে খোঁজ-খবর রাখা যায় এই ধরণের কাজ হয়ে থাকে উপগ্রহের

মাধ্যমে। এর সাহায্যে ঠিক করা যায়—কোথার বন্যা হতে চলেছে, কোথায় বরফ জমেছে, জলের ব্যবস্থা কেমন, বৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে কোথায়, ঝড় আসছে কিনা—এলেও তা কেমন ঝড় হবে, কোথাকার মাটি কেমন, কোথায় মাটির নীচে কি কি খনিজ সম্পদ থাকতে পারে, সমুদ্রের জলের নিচে কোন সম্পদ আছে কিনা, জল দূষণ হচ্ছে কিনা—এইসব নানাবিধ বিষয়ে এই উপগ্রহ খোঁজ-খবর পাঠায়, ছবি তুলে পাঠায়। এছাড়া ভূ-বিন্যাস, ভূতাপ ও নদ-নদী ও হ্রদের মানচিত্র এই উপগ্রহের সাহায্যে তৈরী করা যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভাস্কর-১ উপগ্রহটিকে এইসব কাজের উপযুক্ত করেই তৈরী করেছেন।

ভাস্কর-১ উপগ্রহটির উচ্চতা ছিল ১৫৬০ মিটার, ব্যাস ছিল ১৫৯০ মিলিমিটার। এর ওজন ছিল ৪৪৪ কিলোগ্রাম। বাইরের দিকে ছিল সৌর ব্যাটারির আবরণ।

এই উপগ্রহটি প্রায় বৃত্তাকারে ৯৫ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে কক্ষ পরিক্রমা করে।

১৯৭৯ সালের ৭ই জুন তারিখে উৎক্ষেপণের পর সোভিয়েত দেশ বাদে ভারতের শ্রীহরিকোটা, বাঙ্গালোর ও আমেদাবারে গ্রাউণ্ড-স্টেশনগুলি থেকে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে দেখা গেল উপগ্রহের টেলিভিশন ক্যামেরা কাজ করছে না। সে এক সমস্যা। শেষে সোভিয়েত ও ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রায় এগার মাসের প্রচণ্ড চেষ্টায় টেলিভিশন ক্যামেরা চালু হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের মে মাস থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১ কাজ করে চলেছে।

উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারতের প্রথম রকেট ঃ ভারতের দুটি উপগ্রহ সোভিয়েতের সাহায্যে পর পর মহাকাশে পাঠান হল। এরপর ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ রকেট তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা ঠিক করেন নিজের দেশের তৈরি রকেটে করেই উপগ্রহ

মহাকাশে পাঠান হবে। পরিকল্পনা মত কাজ সুরু হল। রকেট তৈরি করার কাজ চলল এগার বছর ধরে। তারপর পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯৭৯ সালের ১০ই আগস্ট তারিখে ভারতে তৈরী রকেটে করে, উপগ্রহ উৎক্ষেপন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ এই কাজে কৃতকার্য হতে পারেন নি। শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপনের ৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড পরেই উপগ্রহসমেত রকেটটি শ্রীহরিকোটা থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের জলে পড়ে যায়।

ভারতের উপগ্রহ রোহিনী—১ঃ সেদিন ১৯৮০ সালের ১লা জুলাই। ভারতে তৈরি কঠিন জ্বালানি চালিত রকেট সাফল্য অর্জন করল। রকেটটির নাম দেওয়া হয়েছিল—এস্. এল্ ভি, অর্থাৎ স্যাটেলাইট লাঞ্চিং ভিহিকল্ বা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের যান। উপগ্রহটির নাম দেওয়া হয়—রোহিনী-১ ৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের এই উপগ্রহটিকে কক্ষে স্থাপন করা হয়। সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় উদ্যোগে এই রকেট এবং উপগ্রহটি তৈরী হয়েছিল। এই সাফল্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন—আমাদের আর অন্য দেশের সাহায্য না নিলেও চলতে পারে বলে।

উপগ্রহ রোহিনী—২ঃ ১৯৮১ সালের ৩১শে যে তারিখে রোহিনী-২ নামে উপগ্রহটিকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মহাকাশে তোলেন। এই উপগ্রহটির কাজ ছিল ভারতের উপরিভাগের ছবি তুলে পাঠান। কক্ষ পরিক্রমা করে ছবি তোলার জন্য এই উপগ্রহটিকে ৩০০ দিন ধরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আট দিন পরেই রোহিনী-২ উপগ্রহটি বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে নেমে আসে। এই জন্যে উপগ্রহটিতে আগুন ধরে যায় এবং জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়ে যায়।

উপগ্রহ আপ্‌ল ঃ এর পর ভারতে মহাকাশ গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। কিন্তু ভারতে অভাব হল নিজস্ব রকেটের। এবার ভূ-স্থির উপগ্রহ স্থাপন করতে হবে ভূ-সমলয় কক্ষে।

এতে খরচ অনেক, শক্তিশালী রকেটেরও প্রয়োজন। নইলে ছয়শ' কিলোগ্রাম উপগ্রহকে মহাকাশে তুলে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করা সম্ভব হবে না এই উপগ্রহের কাজ হল—পৃথিবীর বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা, টেলিভিশন ও রেডিওর প্রচারে সাহায্য করা।

ভারতের যোগাযোগ—উপগ্রহটি ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির রকেটের সাহায্য নিয়ে ফরাসী গীয়ানার কুরু থেকে উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সে দিনটি ছিল ১৯৮১ সালের ১৯শে জুন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে ভূ-সমলয় কক্ষে তোলা হয়েছিল উপগ্রহটিকে। কিন্তু দুটি সৌর প্যানেল আর কাজ করল না। একটি মাত্র সৌর প্যানেল নিয়ে সাতাশ মাস কাজ করার পরে উপগ্রহটিকে বাতিল করা হয়। তবে, 'ইসরো' থেকে ঘোষণা করা হয়—আপল-এর পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণভাবেই সাফল্য লাভ করেছে বলে। ভারতীয় ডাক বিভাগ এবং 'ইসরো'-র যৌথ উদ্যোগে এই পরীক্ষাকার্যটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইন্‌স্যাট-প্রকল্প ঃ ইন্‌স্যাট কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে—'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল স্যাটেলাইট সিস্‌টেম' বা ভারতীয় জাতীয় উপগ্রহ ব্যবস্থা। আপল প্রকল্পের এক বছর পরে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

ঠিক হয় এই প্রকল্পে থাকবে দুইটি উপগ্রহ।

ইন্‌স্যাট—১—এ

এই প্রকল্পের পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মহাকাশযানের পরিকল্পনা অনুসারে আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান এই ভূ-স্থির উপগ্রহটি তৈরি করে।

১৯৮২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা 'ন্যাসা'-র রকেটের সাহায্য নিয়ে এই উপগ্রহটিকে মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

বিশেষতঃ তিনটি কাজ করার জন্য এই ইনস্যাট-১এ উপগ্রহটিকে তৈরি করে মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। কাজগুলি হল।

(১) টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাহায্য করা!

(২) রেডিও ও দূরদর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করা। এবং

(৩) জলবায়ু সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। এছাড়া এই উপগ্রহটি ঝড়-বৃষ্টি, সমুদ্রের, নদী ইত্যাদির বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে খবর পাঠায়। আর, ভারতের সমুদ্র সমেত সমগ্র ভূ-খণ্ডের মানচিত্র এই উপগ্রটির সাহায্যে প্রস্তুত করার কথা আছে।

ইনস্যাট—১-এ উপগ্রহটির ওজন হল ১৯৫০ কিলোগ্রাম।

ইনস্যাট—১-এ উপগ্রহটি একটি প্রকল্পের প্রথম উপগ্রহ। ঠিক হয়েছিল, এই রকম আরও একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠান হবে। তাতে সময় ধরা হয়েছিল দেড় বছরের মত। এই দ্বিতীয় উপগ্রহটির নাম হবে—ইনস্যাট—১-বি। এই দুটি উপগ্রহ মহাকাশে একই জায়গায় থেকে কাজ করে যাবে।

ইনস্যাট—১-এ উপগ্রহটি বেশ ভালভাবেই তৈরি করা হয়েছিল। ঠিক ঠিক মত কক্ষে স্থাপনও করা গিয়েছিল। যে সমস্ত কাজ এই উপগ্রহটির করার কথা সেই অনুসারে সমস্ত প্রকার যন্ত্রপাতি উপগ্রহটির মধ্যে রাখাও হয়েছিল ঠিক ঠিক মত। ব্যবস্থা ছিল—সাত বছর ধরে এটি যথাযথ-ভাবে কাজ করে যাবে। কিন্তু, তা হয়নি। কিছুদিন পরেই এই উপগ্রহে গোলমাল দেখা দেয়।

গোলমাল দেখা দেয় সৌরপালে, অ্যানটেনাস এবং আরও কিছু যন্ত্রপাতিতে। আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত উপগ্রহটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

ইনস্যাট—১-বি ঃ ইনস্যাট প্রকল্পের দ্বিতীয় উপগ্রহ—ইনস্যাট—১-বি উৎক্ষিপ্ত করা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র থেকে। উৎক্ষেপণের তারিখ ছিল ১৯৮৩ সালের ৩০ শে আগস্ট।

চুক্তি অনুসারে এই উপগ্রহটি তৈরি করে আমেরিকার একটি সংস্থা। সংস্থাটির নাম হল—ফোর্ড এরোস্পেস কমিউনিকেশনস কর্পোরেশন।

ধাপ-রকেটের সাহায্যে ব্যোমযান আকাশে তুললে খরচ হয় কম। তাই এই উপগ্রহটি মহাকাশে তোলা হয়েছিল খেয়া-ব্যোম যানের সাহায্যে।

ইনস্যাট—১-বি উপগ্রহটি আগামী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কাজ করার কথা। এই উপগ্রহটি তৈরি এবং মহাকাশে ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপন করার জন্যে 'ন্যাসা' তার হিসাব মত ১৩ কোটি টাকা খরচের কথা বলেছে।

ইনস্যাট—১-এ উপগ্রহে যে সব গোলমাল দেখা দিয়েছিল, ইনস্যাট—১-বি উপগ্রহেরও সেইসব গণ্ডগোল দেখা দিল। উৎক্ষেপণের দিন দশেক পরে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় গণ্ডগোল সারিয়ে তোলা হয়।

ইনস্যাট—১-বি উপগ্রহটি ভূ-সমলয় কক্ষে—৭৪০ পূর্ব দ্রাঘিমায় ভারতের দক্ষিণে বিষুবরেখার ওপরে এখন রয়েছে। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে রয়েছে ৩৫,৮৮৭ কিলোমিটার ওপরের আকাশে।

রেডিও ও দূরদর্শন প্রচার, টেলিফোন যোগাযোগ এবং আবহাওয়ার খবর দেওয়া—এইসব কাজ এখন করে চলেছে ইনস্যাট—১-বি উপগ্রহটি। এর জোড়া উপগ্রহটি প্রথমে তো বিকল হয়ে বাতিল হয়ে যায়। দুটি উপগ্রহ এক সঙ্গে কাজ করলে নিশ্চয়ই আরো অনেক ভাল ফল হত।

ইনস্যাট—১-বি উপগ্রহ তৈরি করা, তাকে উৎক্ষেপণ করে ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপন করা—এইসব মিলিয়ে ৬৬ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। যে সমস্ত কাজ এই উপগ্রহটি করে চলেছে, তাতে এই ৬৬ কোটি টাকা খরচ বিশেষ কিছুই না। একথা কে কবে

ভাবতে পেরেছিল যে, প্রতি ৩০ মিনিট পর পর আমরা ভারতের আবহাওয়ার খবর জানতে পারব—জেনে অনেক প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উদ্ধার পাব। তবে, দুঃখের বিষয় ইন্‌স্যাট—১-এ উপগ্রহটি কাজ করতে সক্ষম হয়নি বলে বাতিল হয়ে গেছে।

মহাকাশে ভারতীয়ঃ মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর, ইউরি গাগারিন হলেন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী। ইউরি গাগারিন ১৯৬১ সালে ভারতে আসেন। তিনি কলকাতাতেও এসেছিলেন। তাকে দিল্লী এবং কলকাতায় বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেদিন এক সম্বর্ধনা-সভায় বলেছিলেন—একদিন হয়তো আসবে যখন ভারত ও সোভিয়েতের নভশ্চর একযোগে অজানা জগতে অভিযান করবে।

তারপরে ১৯৮০ সালে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনভও দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এক সম্বর্ধনা সভায় একই কথা বলেন।

এরপরের ঘটনা হল—ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একদিন রাজ্য-সভায় ঘোষণা করলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রস্তাব অনুসারে তারা ভারতীয় নভশ্চরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সেইমত ভারত থেকে ভাবী নভশ্চর নির্বাচন করে পাঠান হবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে।

এবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য বাছাই পর্ব শুরু হল। নির্বাচন করা হল দু'জনকে। একজন হলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মা এবং অন্যজন হলেন উইং কমাণ্ডার রবিশ মালহোত্রা। দু'জনেই খুব দক্ষ বৈমানিক। নভশ্চর হতে হলে যতসব গুণ থাকা দরকার তাদের তা ছিল। ১৫০ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে এই দুইজনকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তাঁরা যথা সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গাগারিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে পেঁছিলেন।

রাকেশ শর্মার জন্ম পাঞ্জাবে। তাঁর মা-বাবার বসবাস ছিল পাতিয়ালা শহরে। রাকেশ শর্মার তখন বয়স ছিল ৪৫ বছর। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি ছিলেন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। সর্বমোট—৩৪০০ ঘণ্টা তিনি বিমানে উড্ডয়ন করেছেন।

রবিশ মালহোত্রার জন্ম হল লাহোরে। তার পিতা-মাতার বসবাস ছিল হায়দ্রাবাদে। তাঁর মা কলকাতাতেও ছিলেন। মালহোত্রার বয়স তখন ৩৯ বছর। তিনিও ছিলেন দক্ষ বৈজ্ঞানিক। ১৬০০ ঘণ্টা তিনি বিমানে উড্ডয়ন করেন।



ভারতীয় মহাকাশচারীরা

রাকেশ শর্মা হায়দ্রাবাদে নিজামী কলেজে পড়াশুনা করেন। রবিশ মালহোত্রা পড়াশুনা করেন কলকাতায়। এরপর দুইজনেই জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমিতে পড়াশুনা করেন।

সোভিয়েত দেশে ভারতীয় ভাষা-ভাষী নভশ্চরদের দেড় বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই প্রশিক্ষণ ছিল—রুশ ভাষা শিক্ষা, স্পেস-নেভিগেশন, চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যার মৌলিক কিছু বিষয়, নভমণ্ডল ও নভযান পরিচালনা, গবেষণাগার বিমানে ট্রেনিং ফ্লাইট, ওজনহীনতায় কাজ করতে শেখা, ব্যায়াম—ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল নভযান পরিচালনা বিষয়ে যাবতীয় সমস্ত কিছু শিক্ষা লাভ করা।

১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মা নভশ্চর হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহাকাশ অভিযানের পরিচালক হিসাবে কর্ণেল মালিয়াশেভ। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মিঃ রুসভিশনিকভ। এর পরের দলে ছিলেন উইং কমাণ্ডার রবিশ, কর্ণেল বেরোজোভয় এবং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মিঃ গ্রেচকো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যাতে মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকে এই কথা ভেবে সোভিয়েত দেশ নানা দেশের নভশ্চরদের নিয়ে মহাকাশে এক সঙ্গে ঘুরে এসেছেন। ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই সম্মানের অধিকারী হয়েছে। এই সম্মানের অধিকারীদের তালিকায় আছে ঃ পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, জি-ডি-আর, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, কিউবা, মঙ্গোলিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ। ভারতের পক্ষে এশুধু সম্মান নয়—প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত যে—এগিয়ে চলেছে, ভারত ও যে নভশ্চরের দেশ হয়েছে—এই হল ভারতের গর্বের বিষয়।